কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

জুলাই '৮৯

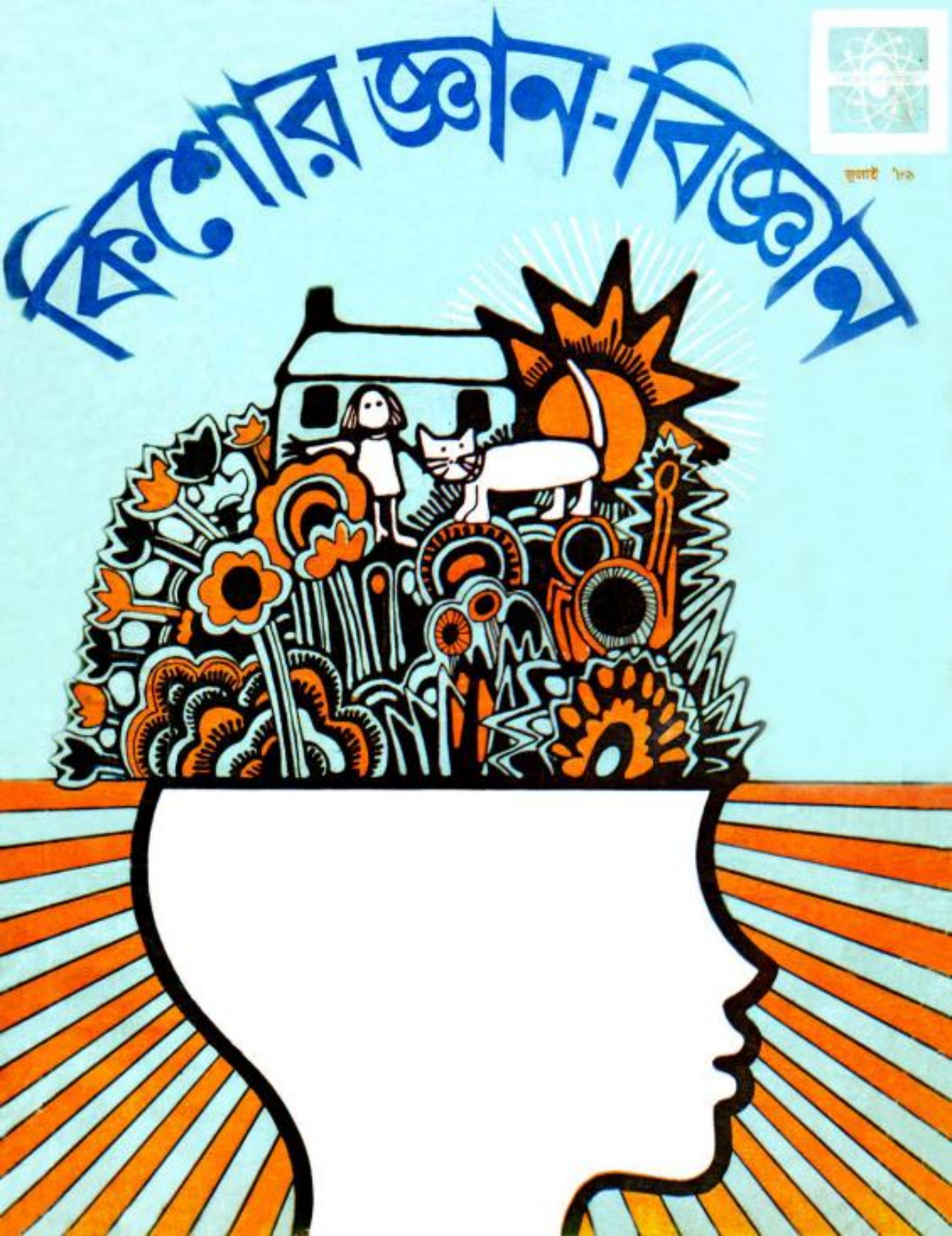

ঘনাদা ও টেনিদার গল্প

প্রেমেন্দ্র মিত্র

ঘনাদার জুড়ি নেই	৫-০০
মঙ্গলগ্রহে ঘনাদা	৫-০০
ঘনাদা বিচিত্রা	১২-০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

টেনিদার অভিযান	১৫-০০
চারমূর্তি	৫-০০
ঝাউবাংলোর রহস্য	৫-০০
কম্বল নিরুদ্দেশ	৫-০০

বিজ্ঞান, বিজ্ঞানী ও কল্পবিজ্ঞান

জাতীয় জীবনীকার মণি বাগচি প্রণীত

বিশ্বের বিজ্ঞানী ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার	১০-০০
মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন	৮-০০
আচার্য জগদীশচন্দ্র	৪-০০
বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ	৪-০০
পরমাণুবিজ্ঞানী ভাবা	৪-০০

সমরজিৎ কর

ভয়ংকর সেই অভিযান	১৫-০০
নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী	১৫-০০

স্বপনবুড়ো

বুক অব নলেজ	১০-০০

সাধন দাশগুপ্ত

আলো আরও আলো	১৫-০০
রোমাঞ্চকর রসায়ন	১২-০০

অমরনাথ রায়

সংখ্যা নিয়ে খেলা	৫-০০
জ্ঞান-বিজ্ঞানের মজার খেলা	৫-০০

ছোটদের বই

বাঙালী রবিনহুডের কাহিনী

বাঙলার নবাবী আমল যখন শেষ, ইংরেজ কোম্পানীর আমল তখন শুরু। শাসনের মুঠি সবে কড়া হচ্ছে। বন-বাদাড় প্রচণ্ডই আছে। ভাল রাস্তাঘাটও হয়নি। পথিক পথ চলতে ভয় পায়। গেরস্থের চোখে ঘুম নেই। কখন বুঝি হানা দেয়—'হাতে লাঠি মাথায় ঝাঁকড়া চুল, কানে তাদের গোঁজা জবা ফুল।' মুখে হা-রে-রে পিলে-চমকানো ডাক। তারাই বাঙলার ডাকাত। সেইসব কাহিনী জানা মানেই প্রাচীন বাঙলাকে জানা। এই বই লিখে যোগেন্দ্রনাথ হৈ চৈ ফেলেছিলেন। আবার সেই বই বেরুল।

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

বাঙলার ডাকাত চারখণ্ডে প্রকাশিত। প্রতি খণ্ড	৬-০০
মহিম ডাকাত	১০-০০

বিশু মুখোপাধ্যায়

বিখ্যাত দস্যুকাহিনী	৬-০০

জীবনচরিতমালা

দেশের শ্রেষ্ঠ মানুষদের জীবনকথা। অপরূপ ভাষায় লিখেছেন প্রখ্যাত জীবনীকার মণি বাগচি। ভূমিকা লিখেছেন ডঃ নীহাররঞ্জন রায়।

রাজা রামমোহন	৫-০০
যুগদেবতা রামকৃষ্ণ	৫-০০
শরৎচন্দ্র	৫-০০
পরমাপ্রকৃতি সারদামণি	৫-০০
আলোকময়ী শ্রীমা	৬-০০
বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ	৫-০০
জীবনীশতক	২৫-০০
সপার্ষদ শ্রীরামকৃষ্ণ	১০-০০

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ • ৮/১সি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩

MINISTER
DEPARTMENT OF INFORMATION
AND CULTURAL AFFAIRS
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

D. O. NO. ....DATE.....................

মন্ত্রী,
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ডি ও নং ....তাং. ২১।৫।৮১

৫৫০/ম/৮১

'কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান' শুধুমাত্র বিজ্ঞান বিষয়ক রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে নিয়মিত মাসিক পত্রিকা হিসাবে প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে জেনে আনন্দিত হলাম। এ ধরনের পত্রিকা ছোটদের বিজ্ঞান পিপাসা মেটাতে সহায়ক হতে পারে বলে আশা করি। প্রয়াস সার্থক হোক।

শুভেচ্ছা রইল।

স্বাক্ষর
(বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য)

সম্পাদক
কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান
৮।১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা—৭০০০৭৩

With Best Compliments From :

Hindustan Motors Limited

Manufacturers of Hindustan Ambassador Car, Truck
Trekker and Heavy Earthmoving Equipment.

Registered Office at :
9/1 R. N. MUKHERJEE ROAD, CALCUTTA 700 001
Gram : HINDMOTOR Phone : 23-9610

Factories at :
HINDMOTOR (West Bengal) & TRIVELLORE (Tamil Nadu)

প্রকাশিত হল

ধীমান দাশগুপ্তের

বিশ্ববিজ্ঞানের ইতিহাস ১৫·০০

নতুন সংস্করণ সুধাংশু পাত্রের

প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানী (৪র্থ সংস্করণ) ১০·০০

ভারতের বিজ্ঞান সাধক তিন খণ্ডে (২য় সংস্করণ) প্রতি খণ্ড ৭·০০

কিশোর অমনিবাস (৫ম সংস্করণ) ১০·০০

উপদেষ্টা : বনফুল/শিবরাম চক্রবর্তী. সম্পাদনা : ধীমান দাশগুপ্ত।

সুনীল জানার বাঘের দুধ ৬·০০

আরথার কোনান ডয়েল

শারলক হোমসের শ্রেষ্ঠ গল্প (২য় সংস্করণ) ১০·০০

একশো ছড়া ভূমিকা : অন্নদাশঙ্কর রায়, সম্পাদনা : ধীমান দাশগুপ্ত ৮·৫০

প্রকাশক : বাণী শিল্প, ১১৩ই কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা—৯
প্রাপ্তিস্থান : দে বুক স্টোর, নাথ ব্রাদার্স, কথা ও কাহিনী, শৈব্যা পুস্তকালয়

১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা ॥ জুলাই ১৯৮১

সূচীপত্র ঃ

শুভেচ্ছা ॥ ১
সম্পাদকীয় ঃ ৩
দপ্তর থেকে
সমুদ্রের সম্পদ ॥ সমরজিৎ কর ৪
উপন্যাস
শার্লক হোমস্ প্রফেসর চ্যালেঞ্জার
ও মঙ্গলগ্রহ ঃ অদ্রীশ বর্ধন ৯
গল্প
উড়ন্ত প্লেনে আগুনের রহস্য ॥ বৃন্দাবনচন্দ্র বাগচী ১৭
পারমাণবিক ঘড়ি ॥ সন্তোষ চট্টোপাধ্যায় ৪৩
জ্ঞান-বিজ্ঞানের নির্বাচিত রচনা
শক্তি কোথায় পাই ॥ সুর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র ৪৫
কণ্ট্যাক্ট লেন্স ॥ সমীরকুমার ঘোষ ২১
প্রাণীরাও প্রসাধন করে ॥ শ্রীকুমার রায় ২৫
মাটি থেকে আকাশে ঃ পার্থসারথি চক্রবর্তী ৪৯
বিদ্যুৎশক্তির শৈশব ॥ গঙ্গেশ বিশ্বাস ৩০
কোন্ দিন কি বার ? ॥ অনির্বাণ চক্রবর্তী ১৩
পড়াশোনা
রসায়নের সহজ পাঠ ঃ অমরনাথ রায় ৩৩
সোজাপথে জ্যামিতি ॥ সিদ্ধার্থ ঘোষ ৪১
আবিষ্কারের গল্প
অনুপ্রভ পদার্থ ॥ বিবেক রায় ৫৪
বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী
ঊষাকালের বিজ্ঞানী পীথোগোরাস ॥ বিমলেন্দু মিত্র ১৫
বিজ্ঞানের ভেলকি ॥ এ. সি. সরকার ২৯
ভেবেচিন্তে উত্তর দাও ॥ শুভব্রত রায়চৌধুরী ৫৩
ছবিতে গল্প
হাবুলের বিজ্ঞান ভাবনা ৫৬
অজানা মহাকাশে ৪৭
পশুপাখির পরিচয়
বাঁদর ॥ যোগীন্দ্রনাথ সরকার ৫২
নিয়মিত বিভাগ
ধাঁধা ২৮ ॥ বিজ্ঞান বিচিত্রা ৬ ॥ শব্দকূট ৩২
বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা ৮ ॥ টুকরো খবর ॥ ১৪
টুকিটাকি ২২, ৪২
হিন্দুস্কুল সায়ান্স সেণ্টার ॥ কিন্নর রায় ২৩

প্রধান সম্পাদক ঃ সমরজিৎ কর
সম্পাদক ঃ রবীন বল
সহ-সম্পাদক ঃ জয়ন্ত দত্ত

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

সম্পাদকীয়

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান তৃতীয় সংখ্যা বের হল। চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে—সেই সঙ্গে আমরাও ভাবছি আরও নতুন নতুন বিষয় যোগ করার কথা।

'চিঠিপত্র' ও 'ছোটদের বিভাগ' শীগগীরই শুরু করা হবে—সেই সঙ্গে পড়াশোনা বিভাগেও আরও নতুন বিষয় যুক্ত হবে। রসায়ন ও গণিতের সঙ্গে সঙ্গে পদার্থবিদ্যা ও জীবন-বিজ্ঞানের উপরেও আলোচনা শুরু করবেন অভিজ্ঞ শিক্ষক ও খ্যাতনামা লিখিয়েরা।

গণিত অর্থে শুধু পাটীগণিত নয়,—বীজগণিত ও জ্যামিতির আলোচনাও থাকবে। এই সংখ্যায় একটি সুন্দর লেখা লিখেছেন সিদ্ধার্থ ঘোষ—'সোজাপথে জ্যামিতি'। এই সংখ্যা থেকেই যাদু সম্রাট এ. সি. সরকার শুরু করেছেন 'বিজ্ঞানের ভেলকি'।

এ ছাড়া, বিজ্ঞানীদের জীবনী, ধাঁধা, বিজ্ঞান-বিচিত্রা, বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা প্রভৃতি বিভাগ তো রয়েছেই।

তবু আরও নতুন বিভাগ, আরও অনেক নতুন বিষয়ে কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করতে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

সমুদ্রের সম্পদ

সমরজিৎ কর

প্রাচীনকাল থেকে মানুষের কাছে সমুদ্রের সম্পদ বলতে বোঝাত দুটি মাত্র সামগ্রী, সমুদ্রের মাছ আর লবণ। সমুদ্রকে তখন অনেকে বলত জীবন। একের পর এক আসে ঋতু। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত। সমুদ্র কখনও বা শান্ত। কখনও বিক্ষুব্ধ। কিন্তু বেপরোয়া মানুষের কাছে এসব গ্রাহ্যের মধ্যেই ছিল না। নৌকা ভাসিয়ে, আর সেই সঙ্গে হাতের মুঠোয় প্রাণটি নিয়ে তারা সমুদ্রের বুকে মাছ ধরত। অনেকে সেই মাছ খেয়েই কাটিয়ে দিত দিনের পর দিন। নুন মাখিয়ে রোদে শুকিয়ে রেখেও দিত। যখন অকাল, সমুদ্রের বুকে নামত ঝড় ; অথবা প্রচণ্ড শীতে যখন বৃষ্টির সঙ্গে বরফ পড়ত, সেই নোনা মাছই ছিল তাদের কাছে একমাত্র খাবার।

এর পর কতকাল কেটে গেছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হল বড় বড় জাহাজ। তৈরি হল ডুবো জাহাজ। কত রকম সাজ সরঞ্জাম। তাদের সাহায্যে অনুসন্ধান চালিয়ে মানুষ সমুদ্র সম্পর্কে এখন কত কীই না আবিষ্কার করেছে। আর সে সব দেখে কেউ কেউ এমনও বলতে শুরু করেছে, মাটির পৃথিবীতে কত রকম সমস্যা। এত মানুষ! তাদের জন্যে চাই কত খাবার। চাই মোটর-গাড়ি, ট্রাকটার, কলকারখানা চালানর জন্যে খনিজ তেল। সার উৎপাদনের জন্যেও খনিজ তেলের প্রয়োজন হয়। এর পর আছে খনি। লোহা, ম্যাঙ্গানিজ থেকে শুরু করে নানা রকম খনিজ পদার্থ তো প্রায় শেষ হতে চলল। এবার চলুন, আমরা বরং সমুদ্রের নিচে নেমে যাই। সেখান থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে আসি এই সব সামগ্রী।

না। গল্প নয়। গত কুড়ি বছরে অনেক কিছুই আমরা জানতে পেরেছি সমুদ্র সম্পর্কে। বল দেখি, পৃথিবীর সাগর এবং মহাসাগর মিলিয়ে কতটা জল আছে ?

প্রশ্নটি শুনে কেউ কেউ বলবে, কী করে তা জানা যাবে ?

উত্তরটি ঠিকই দিয়েছ। কারণ সাধারণ মানুষের কাছে সমুদ্রের জল কত, সেটা কল্পনা করাও শক্ত। তবে বিজ্ঞানীদের অনুসন্ধানে হিসেবটি ধরা পড়েছে। ধরা পড়েছে আরও অনেক কিছুরই হিসেব।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, পৃথিবীর সাগর এবং মহাসাগরে মোট জল আছে ৩৫ কোটি ঘন মাইল। এই জলের মধ্যে মিশে রয়েছে নানা রকম বস্তু। কোন কোন বস্তু রয়েছে দ্রবীভূত অবস্থায়। আবার কোন কোন বস্তু সূক্ষ্মকণা হিসেবে ভেসে রয়েছে। তাদের হিসেবটিও কম চমকপ্রদ নয়। ওঁরা বলছেন, এক ঘন মাইল সমুদ্রের জলে মিশে রয়েছে ১৬·৫ কোটি টনের মত কঠিন বস্তু। এই কঠিন বস্তুর মধ্যে স্রেফ কাদা এবং বালির কুচিও আছে, সেই সঙ্গে আছে নানা রকম রাসায়নিক বস্তু। এক সময় সমুদ্রের জল থেকে সংগ্রহ করা হত খাবার লবণ, যে কথা আগেই বলেছি, বিজ্ঞানীরা এই বস্তুটিকে বলে থাকেন সোডিয়াম ক্লোরায়েড, এখন সমুদ্রের জল থেকে প্রচুর পরিমাণ ব্রোমায়েড এবং ম্যাগনে-সিয়ামও সংগ্রহ করা হচ্ছে।

সমুদ্রের গভীরে ভূস্তরের উপরের অংশটি কেমন ?

সমুদ্রের উপর থেকে সেটা তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না।

গত কয়েক বছরে সমুদ্র সন্ধানী জাহাজ থেকে অনুসন্ধান চালিয়ে সে সম্পর্কে কত রকম কথাই না জানা গেছে। পৃথিবীর ভূ-ভাগের যেমন কোথাও সমতল, কোথাও পাহাড় পর্বত, সমুদ্রের নিচের ভূ-ভাগও ঠিক তেমনি। আতলান্তিক মহাসাগরের মাঝবরাবর দক্ষিণ থেকে উত্তর পর্যন্ত একটানা চলে গেছে বিরাট এক পর্বতমালা। জলের উপর থেকে তাকে পুরোপুরি দেখা যায় না। শুধু মাঝে মাঝে তার কিছু অংশ দ্বীপের মত জলের উপর মাথা ভাসিয়ে বিরাজ করছে। দীর্ঘ এই পর্বতমালার ভূস্তরে সন্ধান মিলেছে নানা রকম খনিজ পদার্থের। সমুদ্রের নিচে রয়েছে অজস্র আগ্নেয়গিরি। প্রশান্ত মহাসাগর, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া গ্রীন-ল্যাণ্ডের কাছাকাছি অঞ্চলে এবং আরও অনেক জায়গায় এই সব আগ্নেয়গিরি দেখা যায়। এদের মধ্যে কোন কোনটি এখনও জ্বলন্ত। অনেকে নিভেও গেছে। ওই সব অঞ্চলে পাওয়া গেছে প্রচুর গন্ধক।

প্রশান্ত মহাসাগরের নিচে ছড়িয়ে রয়েছে প্রচুর ম্যাঙ্গানিজ। শুনলে খুশি হবে, ভারতের দক্ষিণে ভারত মহাসাগরেও প্রচুর ম্যাঙ্গানিজের সন্ধান দিয়েছেন আমাদের বিজ্ঞানীরা।

সমুদ্রের জলে যে সব সামগ্রীর সন্ধান পাওয়া গেছে তাদের কিছু কিছু পরিচয় দিই। প্রতি ঘন মাইল জলে : ক্লোরিন ৮৯৫০০০০০ টন ; সোডিয়াম ৪৯৫০০৩০ টন, ম্যাগনেসিয়াম ৬৪০০০০০ টন ; গন্ধক ৪২০০০০০ টন ;

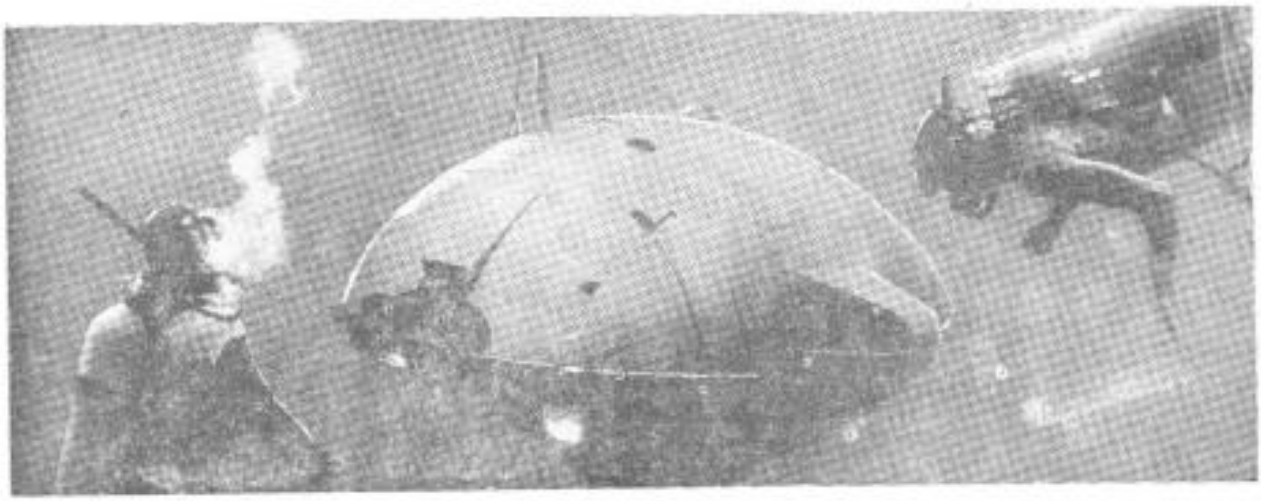

বিশেষ ধরনের যানের (ব্যাথাইস্কোপ) সাহায্যে বিজ্ঞানীরা ডুব দিয়ে, সমুদ্রের নীচে সন্ধান চালাচ্ছেন

ক্যালসিয়াম ১৯০০০০০ ; পটাসিয়াম ১৮০০০০০ টন ; ব্রোমিন ৩০৬০০০ টন ; কারবন ১৩২০০০ টন ; স্ট্রনসিয়াম ৩৮০০০ টন ; ফ্লুওরিন ১৪০০০ টন ; নাইট্রোজেন ২৪০০ টন ; ফসফরাস ৩৩০ টন ; আইওডিন ২৮০ টন ; দস্তা ৪৭ টন ; লোহা ৪৭ টন ; টিন ১৪ টন ; ইউরেনিয়াম ১৪ টন ; লিজেল ৯ টন ম্যাঙ্গানিজ ৯ টন ; কোবল্ট ২ টন ; রূপা ১ টন ; সিসে ০·১ টন ; পারদ ০.১ টন এবং সোনা ০.০২ টন।

সমুদ্রের কোন কোন অঞ্চলে পাওয়া গেছে প্রচুর কয়লা। দেখা যাচ্ছে ১৬২০ সালে স্কটল্যাণ্ডের মানুষ সমুদ্র গহ্বর থেকে কয়লা সংগ্রহ করত। এখন পৃথিবীতে মোট ১০০টি খনিতে কাজ চলছে। এই সব খনি সমুদ্র উপকূলের কাছাকাছি অঞ্চলে অবস্থিত। সেখান থেকে তোলা হচ্ছে কয়লা, তামা এবং নিকেলের আকরিক। কোথাও কোথাও সমুদ্রের নিচের ভূস্তরের ৮০০০ ফুট গভীরে খনন চালিয়েও কয়লা সংগ্রহ করা হচ্ছে।

সমুদ্রের ভূগর্ভে খনির কাজও চলছে। যেমন ধর ফসফেটের কথা। সমুদ্রগর্ভে ১০০ থেকে ১০০০ ফুট ভূস্তরের মধ্যে রয়েছে প্রচুর ফসফেট। দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার সমুদ্রে পাওয়া গেছে পৃথিবীর বৃহত্তম ফসফেট স্তর, অনুমান সেখান থেকে ১·৫ বিলিয়ন টন ফসফেট পাওয়া যাবে। এ ছাড়া প্রচুর ফসফেট পাওয়া গেছে মেকসিকো পেরু, চিলি এবং দক্ষিণ আফ্রিকার সমুদ্রগর্ভে। কোন কোন অঞ্চলে সমুদ্রের জলের নিচে ভূস্তরের উপর ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন ধাতুর পিণ্ড, বেশির ভাগই অবশ্য যৌগিক পদার্থ হিসেবে। এদের মধ্যে অন্যতম ম্যাঙ্গানিজ। প্রশান্ত মহাসাগরের এক জায়গায় প্রতি বর্গমাইলে ৩১০০০ টনের মত ম্যাঙ্গানিজ পিণ্ড ছড়িয়ে রয়েছে।

খনিজ তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস এখন কত বড় সমস্যা সে তো তোমরাও হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছ। তেলের দাম বেড়েছে। ফলে বাসের টিকিটের মাশুল বেড়েছে, সারের দাম বেড়েছে, অনেক কিছুরই দাম বেড়েছে। ভূভাগে যত তেল এবং গ্যাসের খনি ছিল তাদের আমরা দ্রুত শেষ করে ফেলছি। এখন আমাদের চোখ সমুদ্রে। সমুদ্রের নিচে ভূস্তরের গভীরে নলরূপ বসিয়ে তোলা হচ্ছে পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাস। আমাদের দেশেও এ কাজ শুরু হয়েছে বোম্বে-হাই- এ, এই জায়গাটি আরব সাগরের মধ্যে, বোম্বাই থেকে কিছু দূরে। আন্দামানের সমুদ্রেও সমুদ্র গর্ভ থেকে তেল সংগ্রহের চেষ্টা চলছে। সমুদ্র গর্ভের ভূস্তর থেকে তেল তোলা হচ্ছে উত্তর সাগরে, আয়ারল্যাণ্ডের উত্তরে। পৃথিবীর বহু দেশ তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের জন্যে নির্ভর করছে সমুদ্রের উপর।

এ ছাড়া খাদ্য তো আছেই। সাগর মহাসাগরে বিচরণ করছেন হাজার রকম মাছ, কাঁকড়া, চিংড়ি প্রভৃতি গভীর সমুদ্রে মাঝে মাঝে তারা ঘুরে বেড়ায়, আধুনিক পদ্ধতিতে তাদের ধরে খাদ্য হিসেবে কাজে লাগানোর কাজ ব্যাপক ভাবে শুরু হয়েছে এখন। এমন কি সমুদ্রের জলজ উদ্ভিদ সংগ্রহ করেও নানা রকম খাবার তৈরি হচ্ছে, তৈরি করা হচ্ছে পশু খাদ্য। তাই বলছিলাম, আগামী কয়েক বছরের মধ্যে অনেক কিছুর জন্যেই হয়ত আমাদের নির্ভর করতে হবে সমুদ্রের উপর।

বিজ্ঞান বিচিত্রা

অনীশ দেব

সংখ্যালঘু হটেন্‌টট্‌

দক্ষিণ আফ্রিকার হটেন্‌টট্‌ উপজাতির লোকেরা অনেকেই সবচেয়ে বড়সংখ্যা বলতে 'তিন' সংখ্যাটা বুঝতো। আসলে ওদের ভাষাতে তিনের চেয়ে বড় সংখ্যা আর ছিলো না। অনেক আফ্রিকা অভিযাত্রীর কাছেই এই বিচিত্র খবর পাওয়া গেছে। হটেন্‌টটের কোন আদিবাসীকে যদি জিজ্ঞেস করো তোমার ছেলেমেয়ে ক'টি, তাহলে সে উত্তর দেবে, এক, দুই, তিন, কিম্বা অনেক। অর্থাৎ, তিনের বেশি হলেই সেই সংখ্যা 'অনেক'। সুতরাং বুঝতেই পারছো ওদের দেশের দু'দে অঙ্কবিদও হেরে যাবে আমাদের দেশের ক্লাস ওয়ানের শিশুর কাছে—কারণ সে অন্তত এক থেকে দশ পর্যন্ত গুনতে পারে!

এবার আর একটা অদ্ভুত জিনিস জেনে রাখো, ঃ বর্তমানে সবচেয়ে আধুনিক যে যন্ত্রগণক—অর্থাৎ, ডিজিটাল কম্পিউটার সে কিন্তু জানে মাত্র দুটো সংখ্যা—শূন্য এবং এক! সে কি তাহলে হটেন্‌টট্‌দের চেয়েও বোকা? না, কারণ একটা গুন এই কম্পিউটারের আছে ঃ সে ওই শূন্য আর এক দিয়েই বড় বড় নানান সংখ্যা তৈরি করে নিতে পারে। এই সংখ্যাগুলোকে বলা হয় যুগ্ম রাশি বা 'বাইনারি নাম্বার'। আজকের ইলেকট্রনিক্সের যুগে এই 'বাইনারি নাম্বার' ছাড়া আমরা একটি পাও চলতে পারি না।

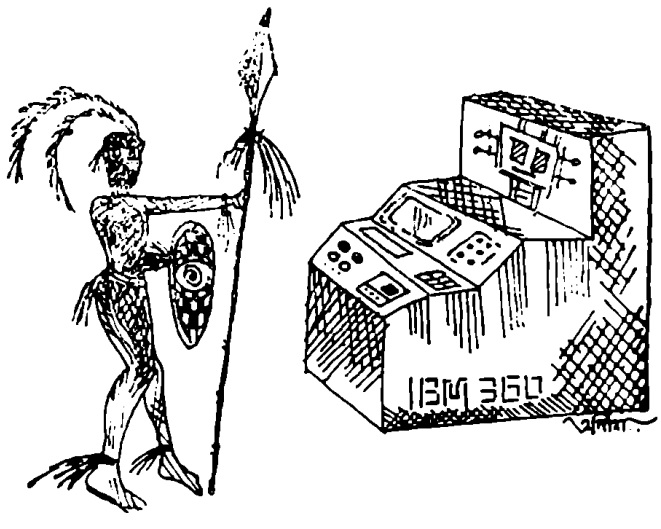

সংখ্যালঘু হটেন্‌টট্‌

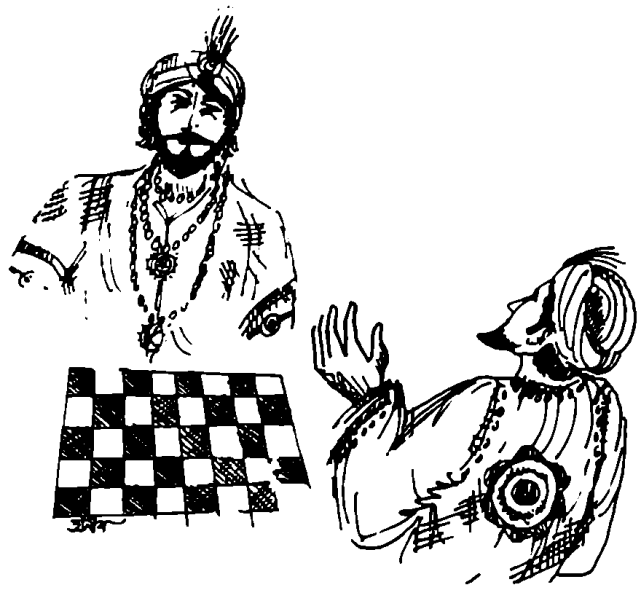

তুমি এই সামান্য দানেই সন্তুষ্ট...

দাবার চাল

চাল দিয়ে দাবার ছক ভর্তি করার এক দাবার চালে মাৎ হয়ে গিয়েছিলেন ভারতের এক প্রাচীন সুলতান শারহম। তাঁর উজীর সিসাবেন দাহির দাবা খেলা শিখিয়েছিলেন সুলতানকে। এবং সেই সঙ্গে একটি দাবার ছকও উপহার দিয়েছিলেন তাঁকে। তখন খুশী হয়ে সুলতান উজীর সিসা-বেনকে তোফা,অর্থাৎ পুরস্কার দিতে চাইলেন। ধূর্ত উজীর বিনয়ের অবতার হয়ে মাথা ঝুকিয়ে বললেন,'জাঁহাপনা, বান্দার চাহিদা খুবই নগন্য। আপনি আমার এই দাবার প্রথম ঘরটায় একটা চাল রাখুন, পরের ঘরটায় রাখুন দুটো চালের দানা, পরেরটায় চারটে, চার নম্বর ঘরে আটটা। এইভাবে জাঁহাপনা, আপনি সামান্য কয়েক বস্তা চাল দিয়ে এই দাবার ছকের চৌষট্টিটা ঘর ভর্তি করে আমাকে উপহার দিন। বান্দার আর কোন লোভ নেই।'

এই সামান্য দানেই তুমি সন্তুষ্ট? অবাক হয়ে বলেছেন সুলতান, আশ্চর্য দাবা খেলা আমাকে শিখিয়ে তার বিনিময়ে এই তুচ্ছ পুরস্কারেই তুমি খুশি? বেশ, তোমার ইচ্ছেই পূর্ণ হোক।' এই কথা বলে সুলতান এক বস্তা চাল নিয়ে আসার আদেশ দিলেন খাদিমকে।

বস্তা এলো। শুরু হল চাল বিতরণ। প্রথম ঘরে একটা, দ্বিতীয় ঘরে দুটো, তৃতীয় ঘরে চারটে—এইভাবে ঘর থেকে ঘরে চালের সংখ্যা দ্বিগুন হয়ে চললো। কিন্তু অবাক হয়ে সুলতান আবিষ্কার করলেন, বিশ নম্বর ঘরে পৌঁছতেই তাঁর প্রথম বস্তা খালি হয়ে গেলো। আবার

তিনি আদেশ দিলেন। আরও চালের বস্তা এলো। কিন্তু এবারে চালের পরিমান ঘর থেকে ঘরে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে লাগলো। একটু পরেই রাজা বুঝলেন, সারা ভারতবর্ষে যে পরিমান চাল আছে তার সবটুকু নিয়ে এলেও সিসাবনের ক্ষুদ্র দাবী তিনি পূরণ করতে পারবেন না। কারণ সিসাবেনের দাবী পূরণ করতে গেলে লাগতো মোট ১৮, ৪৪৬, ৭৪৪,০৭৩, ৭০৯, ৫৫১, ৬৫১ টি চালের দানা।

যদি ধরে নেওয়া যায় যে এক এক বস্তায় ৫, ০০০,০০০ টি করে চালের দানা ছিলো, তাহলে সিসাবেনের দাবী মেটাতে লাগতো মাত্র চার হাজার লক্ষ কোটি (অর্থাৎ ৪ সংখ্যাটির পরে পনেরোটা শূন্য বসালে যে সংখ্যা পাওয়া যায়) বস্তা চাল ! এক বছরে সারা পৃথিবীর চালের উৎপাদন মনে রেখে বলা যায়, মোটামুটি ভাবে দুহাজার বছর ধরে পৃথিবীর সমস্ত চালের উৎপাদন যদি সিসাবেন কে দেওয়া হতো তাহলে হয়তো তাঁর দাবী পূর্ণ করতে পারতেন সুলতান শারহম।

সুলতান শেষ পর্যন্ত সিসাবেনের শিরচ্ছেদের হুকুম দিয়েছিলেন কিনা সেটা সঠিক জানা যায় নি।

সুতরাং এটুকু বুঝলে, সংখ্যার মার পাঁচ খুব ঘোরালো, এবং সাবধান না হলে তোমাদেরও অবস্থা হবে বেচারা সুলতানের মতো !

একটি বিখ্যাত প্রশ্নের উত্তর ঃ—

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা বিজ্ঞান-বিচিত্রায় 'একটি বিখ্যাত প্রশ্ন' রাখা হয়েছিলো তোমাদের সামনে। তার উত্তরও দেওয়া ছিলো। ছিলো না শুধু উত্তরের ব্যাখ্যা। অনেক কৌতূহলী পাঠক-পাঠিকা উত্তরের ব্যাখ্যা পাঠিয়েছে আমাদের দপ্তরে। অনেকেরই ব্যাখ্যা ঠিক হয়েছে, কিন্তু সবচেয়ে ভালো হয়েছে যে উত্তর, সেটা ছাপা হলো তোমাদের সুবিধের জন্য। এই ব্যাখ্যাটি করে পাঠিয়েছে দরগা রোড থেকে শ্রীঅসীমকুমার ভূঁইয়া। প্রসঙ্গতঃ জেনে রাখো, এই ধরণের এক ঘটনা থেকেই আর্কিমিডিস আবিষ্কার করেছেন তাঁর বিখ্যাত 'আর্কিমিডিসের সূত্র।'

যখন পাথরগুলি নৌকার মধ্যে অবস্থিত তখন (নৌকা + পাথর) এর ওজন = অপসারিত জলের ওজন (প্রথম অবস্থায়)।

যখন পাথরগুলি জলের মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া হইল তখন, নৌকার ওজন = অপসারিত জলের ওজন (দ্বিতীয় অবস্থায়)।

সুতরাং প্রথম অবস্থায় অপসারিত জলের ওজন > দ্বিতীয় অবস্থায় অপসারিত জলের ওজন।

অতএব, প্রথম অবস্থায় অপসারিত জলের আয়তন —দ্বিতীয় অবস্থায় অপসারিত জলের আয়তন = অপসারিত জলের আয়তন (V_1), যাহার ওজন নৌকার মধ্যে অবস্থিত পাথরগুলির ওজনের সঙ্গে সমান।

কিন্তু পরে যখন ঐ পাথরগুলি জলের মধ্যে ফেলা হ'ল তখন ঐ পাথরগুলি নিজসম আয়তনের জল (মনেকরি V_2) অপসারিত করে। সেইহেতু V_2, V_1 এর চেয়ে ছোট। সুতরাং যখন পাথরগুলি ঐ দীঘির মধ্যে ফেলা হইবে, তখন দীঘির জলের তল (Surface) নামিয়া যাইবে।

শ্রীঅসীমকুমার ভূঁইয়া
৩০২ বি, দরগা রোড
কলিকাতা-১৭

'রামন এফেক্ট'-এর পঞ্চাশ বছর

কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপনাকালে নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন যে আবিষ্কারের জন্য পদার্থবিজ্ঞান নোবেল পুরস্কার লাভ করে, বিশ্বের বিজ্ঞানী সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করেছিল, এই ১৯৮১ সালে তার পঞ্চাশ বছর পূর্তি একটি স্মরণীয় ঘটনা। এই উপলক্ষে বাঙ্গালোরে রামন রিসার্চ ইনস্টিট্যুটে যে মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানটি হয়েছিল তাতে ইউরোপ ও আমেরিকার বিশিষ্ট পদার্থ-বিজ্ঞানীরা আমন্ত্রিত হয়ে যোগদান করেছিলেন। রবীন্দ্র-নাথের পর স্যার চন্দ্রশেখর দ্বিতীয় ভারতীয় যিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা শ্রীবৈজ্ঞানিক

১। মানুষের দেহ কোষে কতগুলি ক্রোমোসোম আছে।

২। কোন্ পাখির জিভ কণ্টকময় ?

৩। কোন্ মৌলের স্ফুটনাঙ্ক সর্বাপেক্ষা কম ?

৪। কোন্ ধাতু সর্বাপেক্ষা হাল্কা ?

৫। লেবুতে এমন কোন্ ভিটামিন থাকে যা স্কার্ভি রোগ প্রতিরোধ করে ?

৬। সাদা রংযুক্ত কপারের কোন্ লবণ জলের সংস্পর্শে রং পরিবর্তন করে না, অথচ বায়ুতে দীর্ঘকাল ফেলে রাখলে নীল হয়ে যায় ?

৭। ফ্লোরিন, ক্লোরিন, ব্রোমিন ও আয়োডিন মৌলগুলিকে 'হ্যালোজেন' নামে অভিহিত করা করা হয়। 'হ্যালোজেন' নাম দেন কোন্ বৈজ্ঞানিক ?

৮। কোন্ মৌল সর্বাপেক্ষা বেশী সংখ্যক যৌগ গঠন করে ?

৯। চাঁদের নামানুসারে কোন্ মৌলের নাম রাখা হয়েছে ?

১০। পরমানু নিউক্লিয়াসের ব্যাসার্ধ মাপার এককের নাম কি ?

১১। 'ডপলার এফেক্ট' কোন্ সালে আবিষ্কৃত হয় ?

১২। প্রাণি বিজ্ঞানের ভাষায় দর্জি পাখির (Tailor bird) নাম কি ?

(সমাধান থাকবে পরবর্তী সংখ্যায়)

বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা : জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার সমাধান

১। সি. জি. এস. পদ্ধতিতে শক্তির এককের নাম 'আর্গ'।

২। Poly Vinyl Chloride এর সংক্ষিপ্ত নাম P. V. C.

৩। মাইক্রোসকোপ যন্ত্রের আবিষ্কর্তার নাম 'LEEUWENHOEK'

৪। গণিত শাস্ত্রের উপর 'Elements' নামক তেরো খণ্ড গ্রন্থের রচয়িতা হলেন 'ইউক্লিড'।

৫। 'লাংফিশ' শ্রেণীর মাছেরা DIPNOI গোষ্ঠীভুক্ত।

৬। CALCITE নামক যৌগ (ক্যালসিয়াম এর একটি কার্বনেট যৌগ) সুন্দর স্ফটিক রূপে পাওয়া যায়।

৭। এনজাইমের প্রোটিন অংশকে HOLOENZYME বলা হয়।

৮। 'ক্রেসকোগ্রাফ' যন্ত্রের আবিষ্কর্তা আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু।

৯। বারুদের অন্যতম উপাদান পটাসিয়াম নাইট্রেটকে উত্তপ্ত করলে অক্সিজেন গ্যাস নির্গত হয়।

১০। উইলিয়ম র‍্যামজে হিলিয়াম গ্যাস আবিষ্কার করেছিলেন।

১১। যে উদ্ভিদ দেহ থেকে কর্পূর পাওয়া যায় তার নাম CINNAMO UM CAMPHORA.

১২। 'ডাচ মেটাল' হলো তামা ও দস্তার একটি সংকরধাতু।

'রসায়নের সহজ পাঠ' (জ্যৈষ্ঠ, সংখ্যা) ২১ ও ২২ পাতায় নিম্নরূপ পড়তে হবে

ছাপা হয়েছে	হবে	ছাপা হয়েছে	হবে
CuC_2,	CO_2	$FcuCl_3$,	$FeCl_3$
$MgCuC_3$,	$MgCO_3$	HuC,	HCl
$MgCuC_3$,	$MgCO_3$	HuC,	NO
$2CuC_2$,	$2O_2$	$NuCl_3$,	NCl_3
$NaSO_4$,	Na_2SO_4	$NaCuC_3$,	Na_2Co_3
Nau Cl,	NaCl	$CauCl_2$,	$CaCl_2$

ধারাবাহিক উপন্যাস

শার্লক হোমস্ প্রফেসর চ্যালেঞ্জার এবং মঙ্গলগ্রহ

অদ্রীশ বর্ধন

আগে যা ঘটেছে

[লণ্ডনের পুরোন শিল্পদ্রব্যের দোকান থেকে একটি অদ্ভুত কৃস্ট্যাল কিনেছেন শার্লক হোমস—যার ভেতরে বিচিত্র সব দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। বৈজ্ঞানিক চ্যালেঞ্জারকে নিয়ে কৃস্ট্যাল গবেষণায় মেতে উঠলেন হোমস। বিচিত্র ঘরবাড়ী, মাঠ আর অদ্ভুত দর্শন প্রাণী। চ্যালেঞ্জার ও হোমস দুজনে নিশ্চিন্ত হলেন যে, এটা ভিন গ্রহের দৃশ্য। কিন্তু কোন গ্রহের? বিস্তৃত গবেষণার জন্য কৃস্ট্যালটাকে চ্যালেঞ্জারের বাড়ীতে রেখে হোমস চলে গেলেন অন্যান্য ক্রাইম কেসগুলো নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করতে। হঠাৎ বাড়ী ফিরে দেখেন প্রফেসর চ্যালেঞ্জার মোটা কালো কাপড়ে মুখ ঢেকে কৃস্ট্যাল পর্যবেক্ষণ করছেন। হোমসের সাড়া পেয়েই চ্যালেঞ্জার উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। বললেন, হোমস, এটা কোন গ্রহ আমি আবিষ্কার করেছি। কৃস্ট্যাল দিয়ে পরিষ্কার মঙ্গলগ্রহের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। এবং তার অকাট্য প্রমাণও পেয়েছি। তুমিও দেখবে এস পরিষ্কার দুটো চাঁদ দেখা যাচ্ছে—কৃস্ট্যালটার ভেতর—এ দুটো ফোবোস ও ডিমোস না হয়েই যায় না। ইতিমধ্যে বস্তুহীন এসেছিল—বেশী দাম দিয়ে কৃস্ট্যালটাকে ফেরত চাইবে চ্যালেঞ্জারের রুদ্রমূর্তি দেখেই বেচারাকে সটকে পড়তে হয়েছে। হোমসের বাড়ী থেকে আবার চ্যালেঞ্জার বাড়ীতে দুজনেই কৃস্টাল গবেষণায় তন্ময় হয়ে পড়েছেন। অবাক বিস্ময়ে দুজনেই দেখছেন—মঙ্গলগ্রহের বিচিত্র প্রাণী—লম্বা শুঁড়, সরু সরু হাত পা...]

কাষ্ঠ হেসে হোম্‌স্ বললে—"বিজ্ঞানের লাইনে আমিও আছি—এর নাম সায়েন্স অফ ডিডাকসন—অবরোহ বিজ্ঞান। কিন্তু প্রশ্ন তা নয়, চ্যালেঞ্জার।"

"তবে কি ভায়া শার্লক হোম্‌স্?"

জবাবটা দেওয়ার আগে আর একবার কৃস্ট্যালের মধ্যে তাকানো যাক।"

কথা বলতে বলতেই কালো ঘোমটা দিয়ে নিজের আর চ্যালেঞ্জারের মুণ্ড ঢেকে কৃস্ট্যালের মধ্যে তাকাল হোম্‌স্। আবার দেখা যাচ্ছে মঙ্গলের দৃশ্য। লাল পাহাড়। ঘন নীল আকাশ। পাণ্ডুর সূর্য। ছাদ, মাস্তুল, দ্যুতিময় শীর্ষ। ছাদে টহল দিচ্ছে ঢিবির মত থলথলে প্রাণীরা। হঠাৎ একটা প্রাণী উড়ল শূন্যে। কিছুক্ষণ এ-মাস্তুল সে-মাস্তুল দেখে এসে ছাদের কাছাকাছি গিয়ে হঠাৎ ডানা খসিয়ে ধপ করে নেমে পড়ল ছাদের ওপর।

সঙ্গে সঙ্গে বিকট চিৎকার করে উঠে দড়াম করে টেবিল চাপড়ে চ্যালেঞ্জার বললেন—"হোম্‌স্, তোমার বৈজ্ঞানিকই হওয়া উচিত ছিল। ঠিকই ধরেছো তুমি—ডানাটা নকল—উড়বার যন্ত্র।"

ঘোমটা দিয়ে কৃস্ট্যাল চাপা দিয়ে মুখ তুলল হোম্‌স্। "দু'টুকরো হীরের মত জ্বলছে দুই চক্ষু।"

বললে চোয়াল শক্ত করে—চ্যালেঞ্জার, "প্রশ্নটা এবার বলি। কি চায় ওরা?"

"কি আবার চায়?"

"আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমরা যেমন কৃস্ট্যালের মধ্যে দিয়ে ওদের দেখছি—ওরাও তেমনি মাস্তুলের ডগায় লাগানো কৃস্ট্যাল দিয়ে আমাদের ওপর নজর রাখছে। কিন্তু কেন?"

ঝোপের মত দুই ভুরু কুঁচকে বললে প্রফেসর—"বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা আছে বলে। পৃথিবী নামক গ্রহে প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের মত এতবড় বিরাট ব্রেনওলা বৈজ্ঞানিক যখন আছে, তখন মানুষ জাতটাও নিশ্চয় পর্যবেক্ষণের বস্তু।"

উন্মনা হয়ে গেল হোম্‌স্। বললে আপন মনে—"ওদের কৃস্ট্যাল পৃথিবীতে এল কিভাবে? কেন?"

"আফ্রিকার বর্বররা যেমন ইউরোপের কাণ্ডকারখানা বুঝতে পারে না—আমরাও হয়তো সেই অবস্থায় রয়েছি, হোম্‌স্।"

হোম্‌স্ প্রফেসরের চোখে চোখ রেখে বললে আস্তে আস্তে—"ওদের কৃস্ট্যাল পৃথিবীতে পৌঁছেছে আগে। নজরও রাখছে ওরা আমাদের ওপর—এরপর কি ওরা নিজেরাই আসবে এই গ্রহে?"

প্রদীপ্ত হল চ্যালেঞ্জারের নীল চক্ষু—'পৃথিবী আক্রমণ?'

ঠোঁট টিপে রইল শার্লক হোম্‌স্।

[চার]

কৃস্ট্যাল কবে এসেছিল পৃথিবীতে ?

নাওয়া খাওয়া উড়ে গেল চ্যালেঞ্জার এবং হোম্‌সের স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের দু'চারটে কেস নিয়ে একটু মাথা ঘামিয়ে চ্যালেঞ্জারের স্টাডিরুমে দৌড়ে আসা আরম্ভ হল হোম্‌সের। চ্যালেঞ্জারও নিবন্ধ লেখা বন্ধ রেখে যখন তখন মাথায় কালো কাপড় চাপিয়ে দিনের মধ্যে প্রায় ষোল ঘণ্টা চেয়ে রইলেন কৃস্ট্যালের মধ্যে দিয়ে মঙ্গলগ্রহের শহরের দিকে। চ্যালেঞ্জার-গৃহিণী স্বামীর পাগলামি জানতেন। জিজ্ঞাসাও করলেন না হঠাৎ পড়ার ঘরে হোম্‌সকে নিয়ে দিনরাত বসে থাকা হচ্ছে কেন।

চ্যালেঞ্জারের আত্মম্ভরিতা বিশ্ববিখ্যাত। অহংকারে মট মট করছেন··· শিবের মাথায় বেলপাতা দিলেই যেমন খুশী—চ্যালেঞ্জারের কাছে একটু প্রশস্তি তার চাইতেও বেশী কাজ দেয়।

ধুরন্ধর হোম্‌স্ তাই তক্ষুনি বললে—"বিলক্ষণ। আপনার সমসাময়িক বৈজ্ঞানিকরা কেবল আপনাকে চিনতে পারল না, এইটাই যা দুঃখ।"

"ছেড়ে দাও ওসব ইডিয়টদের কথা। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। ১৮৯৪ সালে একটা প্রচণ্ড বিপর্যয় দেখা গিয়েছিল মঙ্গলের বুকে। হয়ত তখনি তড়িৎ শক্তি অথবা ঐ ধরনের কোনো শক্তি মারফৎ কৃস্ট্যালদের পাঠানো হয়েছে পৃথিবীতে।

...ডাবডেবে চোখে চেয়ে রইল মঙ্গলের প্রাণীরা

এই রকমই একদিনে হোম্‌স্ পুরোনো প্রশ্নটাই নতুন করে জিজ্ঞাসা করেছিল চ্যালেঞ্জারকে "কৃস্ট্যালটা পৃথিবীতে এল কিভাবে ? কবে ?"

প্রফেসর বললেন—"ভায়া, বিষয়টা নিয়ে আমি মাথা ঘামিয়েছি। আমার এই বিরাট ব্রেন যখন কোনো বিষয় ভাবে, তখন তার সুরাহা করে তবে ছাড়ে।"

—বলে, সমর্থনের আশায় প্রোজ্জ্বল চোখে চাইলেন হোম্‌সের পানে।

"কৃস্ট্যালদের।"

তা নিশ্চয়। সাত বছর ধরে যারা অত খুঁটি পুঁতে আমাদের ওপর নজর রাখছে, তারা কি একটা কৃস্ট্যাল এত ঝামেলা করে পাঠাবে ? কক্ষনো না—যত খুঁটি দেখেছি, ততগুলো কৃস্ট্যাল কি তারও বেশী এসে পড়েছে পৃথিবীর নানান জায়গায়। সারা পৃথিবীর ছবি ওরা গত সাত বছর ধরে দেখে আসছে খুঁটিদের মাথায় লাগানো নিজেদের কৃস্ট্যালের মধ্যে দিয়ে।

"উদ্দেশ্য ?"

"পৃথিবী আক্রমণ !"

"ও তো গল্প কথায় অনেক পড়েছি।"

"অনেক গল্প কথাই তো শেষ পর্যন্ত সত্যি হয়, হোম্‌স্। মঙ্গলের বুকে খাল দেখে ১৮৭৭ সালে যখন জল্পনা-কল্পনা আরম্ভ হয়েছিল, তখন তো গল্প কথাই বলা হয়েছিল সব ব্যাপারটাকে। কিন্তু আমরা তো নিজেদের চোখে দেখেছি টানা লম্বা খাল রয়েছে শহরের ঠিক পাশেই।"

হোমসের চোখের সামনে ভেসে উঠল সেই দৃশ্য। কৃস্ট্যালের মধ্যে দিয়ে দেখা দৃশ্য। দূরে লাল পাহাড়। কাছে আয়তাকার ছাদের পর ছাদ, পাশে সবুজ মাঠ। তারও ওদিকে সুদীর্ঘ জলপথ। খাল। মাঠে চলমান মঙ্গলগ্রহীদের যন্ত্রযান। বিভিন্ন সাইজের, বিভিন্ন আয়তনের। বেশীরভাগই মনে হয় স্বয়ংচালিত। কোনো মঙ্গলগ্রহী নেই আশেপাশে। তারা কেউ শুঁড়ের ওপর ভর দিয়ে হাঁটছে মন্থরগতিতে—কেউ নকল ডানা লাগিয়ে উড়ছে এ-খুঁটি থেকে সে-খুঁটিতে। কর্মব্যস্ততা সর্বত্র। গমগম করছে মঙ্গলের শহর।

চ্যালেঞ্জারের গমগমে গলায় সম্বিৎ ফিরল হোমসের—"ভায়া কি ভাবছ ?"

"ভাবছি, এতবড় শহর, এত প্রাণী—অথচ এতদিন শুনেছিলাম মঙ্গলে বাতাস নেই, জল নেই।"

"কিন্তু এখন তো জল দেখলে। বাতাসটা নিশ্চয় ওরা তৈরী করে নিচ্ছে।"

"মঙ্গলের জীবরা ?"

"হ্যাঁ।—লাল মাটি মানেই অক্সিডাইজড্ মাটি। ঐ বাড়ীগুলো আসলে ওদের কলকারখানা। দেখেছো তো এমন ভাবে তৈরী যে বাইরে থেকে চট করে ভেতরে ঢোকা মুস্কিল। আমার মনে হয়, ঐ কলকারখানার মধ্যেই বড় বড় মেশিনে মাটি থেকে অক্সিজেন বার করে নিয়ে নকল হাওয়া তৈরী করে বেঁচে আছে মঙ্গলগ্রহীরা।"

"লোকে শুনলে কিন্তু উদ্ভট কল্পনা বলবে।"

বলেই হোম্‌স্ বুঝল বেফাঁস কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। বজ্রগর্জনে কড়িকাঠ পর্যন্ত কাঁপিয়ে চ্যালেঞ্জার টেবিলে দমাদম ঘুসি মারতে মারতে বললেন—"কোন্ বেল্লিকটা বলে সে কথা ?"

অত ঘুসি খেয়ে নিষ্প্রাণ টেবিল পর্যন্ত শিউরে উঠল যেন। কৃস্ট্যাল গড়িয়ে গেল ওপর থেকে কিন্তু মাটিতে পড়ার আগেই খপ করে লুফে নিয়ে হোমস বললে—"আপনাকে যারা দেখতে পারে না—সেই পিগমী বৈজ্ঞানিকরা।"

আগ্নেয়গিরি নিভে গেল সঙ্গে সঙ্গে। গজরাতে গজরাতে চ্যালেঞ্জার হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—"দাও কৃস্ট্যালটা।"

[পাঁচ]

মঙ্গলে অগ্ন্যুৎপাত ?

ডিসেম্বর গড়িয়ে গিয়ে জানুয়ারী এসে গেল। সালটা ১৯০২। মে মাস শুরু হল। দীর্ঘ এই ক'টি মাস শার্লক হোম্‌স্ ব্যস্ত রইল চোর-ডাকাত-খুনে-গুণ্ডাদের রহস্য নিয়ে। ফাঁকে ফাঁকে দৌড়ে যেত চ্যালেঞ্জারের বাড়ীতে। গিয়ে দেখত যোগীবরের মত কৃস্ট্যাল নিয়ে মঙ্গলের চেহারা দেখে চলেছেন ভদ্রলোক। আর লিখে চলেছেন পাতার পর পাতা।

কৃস্ট্যাল রহস্য কিন্তু আর কেউ জানল না। প্রফেসরের কড়া নির্দেশে ডাক্তার ওয়াটসনকে পর্যন্ত হোম্‌স্ কিছু বলল না। প্রফেসরের সহধর্মিণীও কিছু জানলেন না।

কিন্তু মে মাসের তেরো তারিখে জেনে গেল পৃথিবীর মানুষ বিস্ময়কর অগ্ন্যুৎপাত শুরু হয়েছে মঙ্গলের বুকে। ব্রেকফাস্ট টেবিলে খেতে খেতে ওয়াটসনই প্রথম দেখল খবরটা খবরের কাগজে। জাভার একটা মানমন্দির থেকে দেখা গেছে, আগের দিন মধ্যরাত্রে অকস্মাৎ ঠিক যেন কামান থেকে আগুনের রাশি ছুটে আসার মত অগ্নিবর্ষণ ঘটেছে মঙ্গলগ্রহের বুকে। স্পেক্‌ট্রোগ্রাফ বিশ্লেষণ করে অবশ্য জানা গেছে, অতি-উত্তপ্ত হাইড্রোজেন ঠিকরে বেরুচ্ছে মঙ্গলপৃষ্ঠ থেকে—ভয়ংকর বেগে ছুটে আসছে পৃথিবীর দিকে। পনেরো মিনিটের মধ্যেই অদৃশ্য হয়ে গেছে রহস্যময় অগ্নিদ্যুতি।

খবরটা পড়ে শুনিয়েই একটা মিটিং অভিমুখে দৌড়োলো ওয়াটসন। হোম্‌স্‌ও উঠে গিয়ে টেলিফোন করল প্রফেসর চ্যালেঞ্জারকে।

রিসিভার ধরলেন প্রফেসর স্বয়ং—"হোম্‌স্ নাকি ? চলে এস। দুনিয়াকে তাক লাগিয়ে দেওয়ার মত খবর পরিবেশনের সময় এবার হয়েছে। স্টেণ্টকে ডেকে পাঠিয়েছি—জ্যোতির্বিদ স্টেণ্ট।"

চ্যালেঞ্জারের বাড়ী গিয়ে হোম্‌স্ কিন্তু দেখল তুমুল কিছু একটা হয়ে গিয়েছে। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ছটফট করছেন প্রফেসর-জায়া। হোম্‌স্‌কে দেখেই দৌড়ে এসে বললেন—"এক্ষুনি যান—জর্জকে থামানো যাচ্ছে না।"

ওপরতলায় গিয়ে হোম্‌স্ দেখল রুদ্রমূর্তিতে পায়চারী করছেন জর্জ এডোয়ার্ড চ্যালেঞ্জার। কি ব্যাপার ? না,

স্টেন্ট নামধারী জ্যোতির্বিদ কৃস্ট্যালের মধ্যে বিস্ময়কর দৃশ্যটি দেখবার পর প্রফেসরকে রবার্ট হুডিনির মত প্রতিভাধর ম্যাজিসিয়ান বলেছিলেন এবং ম্যাজিক লণ্ঠনের চাইতে অদ্ভুত যন্ত্র আবিষ্কারের কৃতিত্ব দিয়েছিলেন। চ্যালেঞ্জার এই কৃতিত্ব গ্রহণ করতে পারেন নি। ভদ্রলোককে সবলে দোতলা থেকে একতলায় ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার জন্যে 'শুধু' উঠে দাঁড়িয়েছিলেন—কিন্তু মনোভাব ব্যক্ত করার আগেই এবং তা কার্যে পরিণত করার আগেই নাকি ভীতু খরগোশের পড়-পড় করে দৌড়ে পালিয়েছেন স্টেন্ট। একি অসভ্যতা? সৌজন্যতা বলে জিনিসটা কি জানা নেই স্টেন্টের? বাড়ী থেকে বিদেয় হওয়ার আগে বিদায় নিতে হয় গৃহস্বামীর কাছে, এটা কি শিখিয়ে দিতে হবে?

ক্ষিপ্ত প্রফেসরকে ঠাণ্ডা করে কৃস্ট্যালের মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চমকে উঠল শার্লক হোম্‌স্।

মঙ্গলের দৃশ্য তো আর দেখা যাচ্ছে না। এতো একটা ধাতব কক্ষ। অদ্ভুত যন্ত্রপাতি দেখা যাচ্ছে কক্ষের গায়ে। চৌকোণা ঘর নয়—চোঙার মত। মেঝের ওপর নিমেষহীন নয়নে তাকিয়ে নেতিয়ে পড়ে রয়েছে কয়েকটা মঙ্গলের প্রাণী। খুব কাছ থেকে দেখা যাচ্ছে এবার। চামড়ার মত গা ভিজে রয়েছে—চকচক করছে। শুঁড়গুলো এলিয়ে রয়েছে যন্ত্রপাতির ওপর। প্রায় নিস্পন্দ বললেই চলে বীভৎস জীবগুলোকে।

গা ঘিনঘিন করে উঠল হোমসের। বললে—"গা চকচক করছে কেন? ঘেমেছে নাকি?"

গুরুগম্ভীর কণ্ঠে প্রফেসর বললেন—"চামড়া থেকে গ্রন্থির রসক্ষরণ জাতীয় কিছু একটা হচ্ছে নিশ্চয়। মানুষের মত মোটেই নয় এরা—সুতরাং এদের পাচনতন্ত্র এবং শরীর থেকে আবর্জনা বার করে দেওয়ার ব্যবস্থাও নিশ্চয় অন্য রকমের।"

ড্যাবডেবে চোখে চেয়েই রইল মঙ্গলের জীবরা। ঘুমোয় না নাকি? জলভরা চামড়ার থলির মতই চকচকে দেহটা থেকে থেকে কেবল ফুলে উঠছে।

হোম্‌স্ বললে—"মঙ্গলের দৃশ্য আর দেখা যাচ্ছে না কেন?"

"কারণ ওরা আর মঙ্গলে নেই।"

"তবে কোথায়?"

"মহাশূন্যে। শূন্যপথে মহাকাশযানে চেপে ছুটে আসছে পৃথিবীর দিকে। পৃথিবী অভিযান শুরু করেছে মঙ্গলগ্রহীরা। এই কথাটাই বোঝাতে চেয়েছিলাম মাথামোটা স্টেন্টকে—আমাকে বলে কিনা ম্যাজিসিয়ান!"

কথাটা ঘুরিয়ে দিল হোম্‌স্—"কিন্তু পৃথিবীতে ওরা আসছে কেন?"

"পৃথিবীকে জ্ঞান দিতে। অথবা পৃথিবীর জ্ঞান লুঠ করতে। দুটোই সমান বিপজ্জনক পৃথিবীর পক্ষে!"

"বৈজ্ঞানিকদের তাহলে তো সজাগ করা দরকার।"

ফুঁসে উঠলেন প্রফেসর,—"স্টেন্টের সঙ্গে ঐ ঘটনার পরেও কি আমার আক্কেল হয়নি বলতে চাও? হোম্‌স্, পুরোধা যাঁরা হন—চিরকালই তাঁদের এমনি হাসি টিটকারি বিদ্রূপ গালাগাল সহ্য করতে হয়েছে। জীবাণুর জন্যেই রোগ হয়, এই কথা বলতে গিয়ে পাস্তুর কি বছরের পর বছর বিদ্রূপের পাত্র হন নি? গ্যালিলিওকে চূড়ান্ত শাস্তি পেতে হয়নি সূর্যের চারদিকে গ্রহরা ঘুরছে—এই কথা বলতে গিয়ে? ডারউইনের বিবর্তনবাদকে মিথ্যের ঝুড়ি বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়নি? মাইডিয়ার হোম্‌স্, জর্জ এডোয়ার্ড চ্যালেঞ্জারও হাস্যাস্পদ হবে মঙ্গলগ্রহীরা পৃথিবী আক্রমণ করতে আসছে—এই কথা বললে। সুতরাং—।" সুতরাং মুখে চাবি দিয়েই রইলেন প্রফেসর। সেইসঙ্গে হোম্‌স্। কিন্তু সেই দিনই মধ্যরাত্রে ফের আগুনের ঝলক দেখা গেল মঙ্গলের বুকে। তারপরের দিন মধ্যরাত্রে আবার। তারপরেও আবার। এইভাবে ১২ই মে মধ্যরাত্রি থেকে শুরু করে ২১শে মে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত আগুনের পাহাড় থেকে আগুন ছিটকে যাওয়ার মত, অথবা বিশাল কামান থেকে অগ্নিবর্ষণের মত, মোট দশবার বিস্ময়কর অগ্নি বিচ্ছুরণ ঘটল মঙ্গলের বুকে। সারা ইউরোপ, সারা পৃথিবীর মানমন্দির থেকে দেখা গেল এই দৃশ্য।

এইচ, জি, ওয়েলস তাঁর বিখ্যাত "ওয়ার অফ দ্য ওয়ার্ল্ডস্" উপন্যাস লেখার আয়োজন করলেন প্রায় সেই সময় থেকেই।

রোজরাত্রে এসে কৃস্ট্যালের দিকে চেয়ে থাকত হোম্‌স্। মঙ্গলের জীবেরাও চোখের পাতা না ফেলে চেয়ে থাকত ওর পানে। দুজনে দেখছে দুজনকে। মঙ্গলগ্রহীর মুখ ভাবলেশহীন। হোম্‌স্ উত্তেজিত। তারপর ফুস করে একসময়ে নিভে যেত কৃস্ট্যালের আলো।

সঙ্গে সঙ্গে গাঁক গাঁক করে উঠতেন চ্যালেঞ্জার—"বুঝলে কারণটা? মঙ্গলের ওপর থেকে নিজেদের কৃস্ট্যাল নিয়ে মহাকাশযানে চড়েছে মঙ্গলের জীব। দেখছে আমাদের প্রতিক্রিয়া। বুঝতে পারছে না পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ একটা মস্তিষ্কও মাথা ঘামাচ্ছে ওদের নিয়ে।"

—ক্রমশঃ

কোন দিন কি বার?

অনির্বাণ চক্রবর্তী

কোন একটি বছরের একটি নির্দিষ্ট তারিখে কি বার ছিল, সেটা কিভাবে বার করা যায়, তাই নিয়ে আমরা আলোচনা করব। তুমি তোমার বন্ধুকে বললে 1932 খ্রীস্টাব্দের নয়ই এপ্রিল কি বার ছিল? রোববার? সোমবার?? অন্য কিছু??? এটা কিভাবে বার করা যায়- সেটাই তোমাকে আমি শেখাবো! ধরো তুমি তোমার বন্ধুদের তাক লাগিয়ে দিতে চাও এই ধরনের গাণিতিক গণনা দেখিয়ে। এটা সোজা যদি তুমি কিছু সূত্র মুখস্থ রাখো। এটা কোন শক্ত কাজই নয়। চারটি সারণী নীচে দেওয়া হলো। এই ক'টা মনে রাখতেই হবে।

প্রথম সারণী

7 14 21 28

দ্বিতীয় সারণী

জানুয়ারী—0, ফেব্রুয়ারী—3, মার্চ—3, এপ্রিল—6, মে—1, জুন—4, জুলাই—6, অগস্ট—2, সেপ্টেম্বর—5, অক্টোবর—0 নভেম্বর—3, ডিসেম্বর—5

তৃতীয় সারণী

1900-0,	1904-5,	1908-3,	1912-1,	1916-6
1920-4,	1924-2,	1928-0,	1932-5,	1936-3
1940-1,	1944-6,	1948-4,	1952-2,	1956-0
1960-5,	1964-3,	1968-1,	1972-6,	1976-4
1980-2,	1984-0,	1988-5,	1992-3,	1996-1

এই সারণীর ছন্দটা অর্থাৎ 0531642 মনে রাখতে পারলেই ব্যাপারটা খুব সোজা হবে।

চতুর্থ সারণী

রবিবার—0, সোমবার—1, মঙ্গলবার—2, বুধবার—3 বহস্পতিবার—4, শুক্রবার—5, শনিবার—6

এই সারণীগুলি মনে রাখার পর কয়েকটা হিসাব করতে হবে। কিভাবে হিসাবগুলি হবে এখন সেই আলোচনা করি।

1. প্রথমে মাসের যে তারিখটা বলা হয়েছে তাকে 7 এর চেয়ে ছোট কর। এরজন্য 7, 14, 21, 28 (সারণী নম্বর এক) বাদ দেবে। আমরা 9 এপ্রিল 1932-এর কথা আলোচনা করছি। তাহলে 9 থেকে 7 বাদ দেবো। যদি 17ই এপ্রিল হতো তাহলে 14 বাদ দিতে হবে আবার 30-এ এপ্রিল হলে? হ্যাঁ, 28 বাদ দেবো।

2. বাদ দেওয়ার পর যে সংখ্যাটা পেলাম (স্বভাবতই 0 থেকে 6-এর মধ্যে থাকার সংখ্যাটি) তার সঙ্গে মাসের সারণীতে (সারণী নম্বর দুই) যে সংখ্যা আছে সেটা যোগ করবো। যোগফলকে আবার প্রয়োজন মতো 7, 14, 21, 28 ব্যবহার করে 7-এর ছোট করে নেবো। ধর যোগফল 17 হলো, তাহলে 14 বাদ দিতে হবে।

3. এবার প্রাপ্ত এই ফলের সংগে তৃতীয় সারণী থেকে বছরের জন্য সংখ্যাটি যোগ কর। এই ফল সাতের বেশী হলে আগের পদ্ধতি ব্যবহার করে কমিয়ে নাও। যে সংখ্যাটা পাবে চতুর্থ সারণীতে সেই সংখ্যার পাশে লেখা তারিখটা দেখে নাও! সেটাই উত্তর।

এবার হাতেকলমে দেখা যাক, ৯ই এপ্রিল 1932

প্রথমে মাসের তারিখ 9-কে ছোট করতে হবে।

$9 - 7 = 2$ [প্রথম সারণী ব্যবহৃত হল]

এবার যোগফলের সংগে মাসের সারণীর মান যোগ করতে হবে।

$2 + 6 = 8$ [দ্বিতীয় সারণী ব্যবহৃত হল]

একে সাতের ছোট করতে হবে।

$8 - 7 = 1$

প্রাপ্ত ফলের সংগে বছরের তালিকার সংখ্যা যোগ করতে হবে।

$1 + 5 = 6$ [তৃতীয় সারণী ব্যবহৃত হলো]

এই সংখ্যা অর্থাৎ 6, 7-এর চেয়ে ছোট; একে আর ছোট করার প্রয়োজন নেই। তাহলে চতুর্থ সারণী থেকে পাই শনিবার।

আর একটা উদাহরণ নিই। 19-এ অক্টোবর 1940

প্রথমেই $19 - 14 = 5$ [9-এর চেয়ে ছোট করা হলো]

$5 + 0 = 5$ [দ্বিতীয় সারণী—মাসের]

$5 + 1 = 6$ [তৃতীয় সারণী—বছরের]

6 হচ্ছে শনিবার 1 [চতুর্থ সারণী থেকে]

লক্ষ্য কর, এখানে কোনটাকেই 7-এর ছোট করতে হলো না।

এবার আর দুটি কথা।

বছরের তালিকায় লক্ষ্য কর চার বছর অন্তর অন্তর তালিকা দেওয়া হয়েছে [প্রত্যেকটিই লিপ্ ইয়ার]। এদের মধ্যবর্তী কোন বছরের হিসাব করতে হলে কি করবে? ধর 1933 খ্রীস্টাব্দ। এর আগে লিপ্ ইয়ার হচ্ছে 1932 এবং (তৃতীয় সারণী থেকে) 1932-এর সংখ্যা হচ্ছে 5 (পাঁচ)। আবার 1933 এবং 1932-

এর মধ্যে তফাৎ হচ্ছে এক। 'এক' সংখ্যাটিকে 5-এর সংগে যোগ করতে হবে। অর্থাৎ আমাদের ক্ষেত্রে সংখ্যাটি হবে 6।

এই ধরনের একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। ধর 11 নভেম্বর, 1958 খ্রীস্টাব্দ।

প্রথম সারণী থেকে $11-7=4$
দ্বিতীয় সারণী থেকে $4+3=7$
7-এর ছোট করার জন্য $7-7=0$
1956 খ্রীস্টাব্দের জন্য $=0$ (তৃতীয় সারণী থেকে)
1958 খ্রীস্টাব্দের জন্য $=(1958-1956)+0$
$=2+0=2$

চতুর্থ সারণী থেকে, 2 হচ্ছে মংগলবার।

আরও একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। ধরো 2-রা জুলাই 1975 ; প্রথম সারণী ব্যবহার করতে হবে না। কারণ 2, 7-এর চেয়ে ছোট। এবার দ্বিতীয় সারণী থেকে জুলাই-এর জন্য 6 যোগ করে পেলাম 8, 7-এর ছোট করার জন্য $8-7=1$; 1972-এর জন্য তৃতীয় সারণী থেকে 6 পাই, 1975 খ্রীস্টাব্দের জন্য ($1975-1972)=3$ পেলাম, এই তিন আগের 1-এর সংগে যোগ করে পাই 4 ; চতুর্থ সারণী থেকে 4 মানে বৃহস্পতিবার।

আর একটা জিনিস মনে রাখতে হবে কারণ সেটা একটু ব্যতিক্রম। যদি কোন লিপ্ ইয়ারের জানুয়ারী বা ফেব্রুয়ারী মাসের বার জানতে চাওয়া হয় তাহলে তৃতীয় সারণী পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে যে ফল পাওয়া যাবে, তার থেকে এক বাদ দিয়ে যে সংখ্যাটা পাওয়া যাবে, সেই সংখ্যাটা 4 নম্বর সারণীতে কোথায় আছে দেখে বারটা ঠিক করতে হবে।

একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। 23শে জানুয়ারী 1948

প্রথম সারণী থেকে $23-21=2$
দ্বিতীয় সারণী থেকে $2+0=2$
তৃতীয় সারণী থেকে $2+4=6$

লিপ্ ইয়ারে জানুয়ারী বা ফেব্রুয়ারী মাসের জন্য শেষের প্রাপ্ত সংখ্যা থেকে 1 বাদ দিতে হবে। তাহলে পাই $6-1=5$; 4 নম্বর সারণী থেকে বোঝা-ই যাচ্ছে এটা শুক্রবার।

একটু খেটে খুটে সারণীগুলো মুখস্থ করে নাও। আর বাড়িতে করেকবার অভ্যাস করে নাও। তাহলে আর তোমাকে পায় কে ? তখন তুমি মাস্টার ম্যাথেমেটিশিয়ান অমুক চন্দ্র অমুক।

৬ সি, নলিন সরকার স্ট্রীট, কলি-৪

বিজ্ঞানের টুকরো খবর

অদৃশ্য জগৎ দৃশ্যমান

মানুষের শরীরকে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা বিশিষ্ট বা তিন বেধ বিশিষ্ট করে দেখা এবং সেই সঙ্গে স্বচ্ছতা বিশিষ্ট করে দেখা কি সম্ভব ? এমন স্বচ্ছতা বিশিষ্ট যাতে শরীরের ভিতরকার হাড়, পেশী, টিসু ও এমনকি রক্তবাহী নালীগুলো পর্যন্ত দেখা যায় ?

জবাবে বলতে হয়, হ্যাঁ। তবে তার জন্য যেটি করা চাই তা হচ্ছে, যাকে বলা হয়, শব্দঘটিত হলোগ্রাফি।

জর্জিয়ার বিজ্ঞানীরা আলোক-তরঙ্গের বদলে শব্দ-তরঙ্গ ব্যবহার করে তিন বেধের চিত্র লাভ করতে পেরেছেন। শব্দ-সংবেদন কোনো বস্তু যখন ডুবে যায় তখন তার উপরিতলে বুদ্‌বুদ্ দেখা দিয়ে থাকে। লেসাররশ্মি ফেলে এই বুদ্‌বুদ্‌গুলোকে উদ্‌ভাসিত করা হয়। প্রতিফলিত লেসার-রশ্মি শূন্যলোকে গড়ে তোলে শব্দ-সংবেদন সেই বস্তুর আলোকমণ্ডিত একটি প্রতিমূর্তি।

শূন্যে দেখা-যাওয়া প্রতিমূর্তিকেই বলা হয় হলোগ্রাম।

শব্দ-তরঙ্গ নিরেট বস্তুকে ভেদ করতে পারে। শব্দ-তরঙ্গের এই ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়েছেন গবেষকরা। আকাংক্ষিত বস্তুকে শব্দ-তরঙ্গের চলার পথে স্থাপন করে সেই বস্তুর হলোগ্রাম তৈরি করেছেন।

তারপরে এমনি একটি হলোগ্রামের মধ্যে দিয়ে পার করিয়েছেন আলোর একটি সাধারণ উৎস থেকে উদ্‌গত রশ্মি। আর তখনই দেখা যাচ্ছে সেই বস্তুর ভিতরকার পৃথক পৃথক অংশের তিন-বেধ বিশিষ্ট একটি প্রতিমূর্তি।

শব্দঘটিত হলোগ্রাফির বহুপ্রকার ব্যবহার হতে পারে। এই পদ্ধতিতে ভূ-পদার্থবিজ্ঞানীরা পেতে পারেন প্রস্তরের তিন-বেধ বিশিষ্ট চিত্র, দেখতে পারেন খনিজ পদার্থ ও তৈলক্ষেত্রের অবস্থান। প্রত্নতত্ত্ববিদরা আগে থেকেই দেখে নিতে পরেন মাটির ভিতরে কী আছে এবং খনন করতে হবে কিনা।

আর চিকিৎসার ক্ষেত্রে শব্দঘটিত হলোগ্রাফি প্রচুর মঙ্গল সাধন করতে পারে, এক্স-রে যেখানে অপারগ সেখানেও এই হলোগ্রামের সাহায্যে দেখা যেতে পারে।

উষাকালের বিজ্ঞানী পীথাগোরাস

বিমলেন্দু মিত্র

বিদ্যেবোঝাই বাবুমশাই শখের বোটে চড়ে মাঝিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন,—"বলতে পারিস, সূঁষি কেন ওঠে? চাঁদটা কেন বাড়ে কমে, জোয়ার কেন আসে?" ইত্যাদি।

এমন একদিন ছিল, যেদিন মানুষ জাতের মধ্যেই ওরকম কোনও বাবুমশাই ছিল না,—কারণ ওরকম "কেন" "কেন" জিজ্ঞাসা করবার মত বুদ্ধিই তাদের হয় নি। মানুষ ক্রমশ বনমানুষ থেকে "মানুষ" হয়ে উঠল। তাদের ঘিলু অন্যরকম হয়ে উঠতে লাগল। তাদের মনে এল—"কেন?" —"চাঁদটা কেন বাড়ে কমে···।" মানুষ হয়ে ওঠার পর থেকেই ভাবনার হাত থেকে মানুষের রেহাই নেই। মানুষের মাথা একটা দারুণ রকম আজব জিনিস হয়ে দাঁড়াল। সেখানে ১৫লক্ষ কোটি (১৫ 'ট্রিলিয়ান') আলাদা আলাদা 'ভাবনা' ঠাসা থাকতে পারে, তা বোধ হয় তোমরা জান না। খাওয়া-দাওয়া খেলা ঘুমের পরেও 'মাথার' সময় থাকে 'ভাবতে বসার'—নইলে সে করবে কি? এই ভাবনা থেকেই আসে 'জানবার ইচ্ছে' আর জানবার ইচ্ছে থেকেই 'বিজ্ঞানের' জন্ম।

আচ্ছা, ভাবনা তো পাগলেও করে? তা হয়ত করে, কিন্তু তারা যুক্তি দিয়ে ভাবতে পারে না। আমরা বিজ্ঞানের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখতে পাব যুক্তির পর যুক্তি সাজিয়ে, ঠিকমত ভাবনা টাবনা করে দুনিয়ার দেখা না-দেখা জিনিস-টিনিস ঘটনা-টটনার ধারাবাহিক জ্ঞান জড়ো করতে শুরু করেছিল প্রথমে সেকেলে গ্রীসদেশের লোকেরাই। আমাদের দেশের মুনিঋষিরা বা চীনদেশের তেনারাও যে যুক্তি দিয়ে, চিন্তা করে বিজ্ঞানের ছোট্ট শিশুটাকে বুকে করে মানুষ করতে এগিয়ে আসেন নি তা নয়। তবুও দেখা যাচ্ছে, আমরা আজকাল বিজ্ঞান বলতে যা বুঝি, তার আঁতুর-ঘর হচ্ছে সেই সেকেলে "গ্রীস", যে দেশ থেকে এদেশে এসেছিলেন বিশ্বজয়ী আলেকজাণ্ডার, প্রায় ২৩০০ বছর আগে।

আলেকজাণ্ডারের জন্মেরও প্রায় ৩০০ বছর আগে গ্রীস দেশের মিলেটাস্ নগরে থেলাস (Thales) নামের এক পণ্ডিত। তিনি 'ভাবতে' বসলেন। এই দুনিয়াটা বেশ নিয়ম মাফিক চলছে। কিন্তু "কেন"? ব্যাবিলন হচ্ছে আরও পুরনো শহর। সেখানকার বুড়োগুলো আগেই চাঁদ, সূঁষি, নক্ষত্র-টক্ষত্র চলার বিবরণ পাথরে কুঁদে লিখে রেখে গিয়েছিল। ব্যাবিলনের ঐসব পাথুরে জ্ঞান থেলাসের অজানা ছিল না। থেলাস দাঁড়িয়ে গেলেন সেকালের গ্রীসের দারুণ "বৈজ্ঞানিক"! সত্যি বলতে কি, প্রথম বৈজ্ঞানিক। আজ থেকে ২৫৬৬ বছর আগে তিনি ভবিষ্যৎবাণী করতে পেরেছিলেন যে ওমুক রাতে চাঁদে গ্রহণ লাগবে। কি আশ্চর্য, মিলে গেল সেই ভবিষ্যৎবাণী!

বাস্তবিকই, গ্রীস একটা অদ্ভুত দেশ। আড়াই হাজার বছর আগে মাত্র তিনশো বছরের মধ্যেই তাদের 'ভাবুক-দাদা'রা (তারা বলত, 'দার্শনিক-Philosopher) জ্ঞান রাজ্যের দিকে দিকে নতুন নতুন ভাবনার বীজ পুঁতেছিল। নতুন চারা শেকড় ছড়িয়ে সেই যে বেড়ে উঠতে আরম্ভ করল, আজ পর্যন্তও মানুষ সেই জ্ঞান-বৃক্ষেরই ডালপালা বেয়ে চাঁদে পৌঁছেছে, আরও দূর মহাকাশে পাড়ি জমাবার তোরজোড় করছে,—ভেঙেছে অ্যাটম, তৈরি করছে নকল সূর্য। বিজ্ঞানের পথে ঠিক-মত চলবার হদিশ গ্রীকরাই বার করে; সে পথের ফটকে স্লোগান লেখা,—যুক্তি দিয়ে ভাব, যুক্তির ভুলগুলো

ঠিকঠাক চিনে তা বাতিল কর, তারপর যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্তে পৌঁছও। এই পথের নিশানা যাঁরা দেখিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে পীথাগোরাস, ইউক্লিড, অ্যারিস্টটল, প্লেটো, হিপোক্রেটিস, আর্কিমিডিস, গ্যালেন—অনেক নাম করা যায়। ধরা যাক পীথাগোরাস!

মিশর বড় পুরনো দেশ। সেখানে যারা জমির মাপজোক করত, রাজার খাজনা ঠিক করবার জন্যে জমি জরীপ করত, তারা 'সমকোণ' তৈরি করবার একটা মজার উপায় বার করেছিলো। একটা লম্বা দড়িকে গাঁট বেঁধে বেঁধে সমান বারোটা ভাগে ভাগ করা হল। তারপর দড়িটাকে টান করে ঘুরিয়ে এমন একটা ত্রিকোণ তৈরি করা হল যার একদিকে রইল তিনভাগ, অন্যদিকে চার ভাগ, আর বাকি দিকটা পাঁচ ভাগ পড়ে। তিনের ভাগ, আর চারের ভাগে যে দুটি সরল রেখা দড়ি দিয়ে তৈরি হল, তাদের মাঝখানের কোণটাই হবে সমকোণ। কেন যে এটা হবে, তা নিয়ে মিশরীরা মাথা ঘামায় নি,—ওরা দারুণ ভাল ইঞ্জিনীয়ার ছিল, হাতেকলমে কাজ হলেই হল। কিন্তু ঐ গ্রীকরা ভাবতে বসল,—কেন হবে? স্রেফ ভেবেই তারা বুঝে ফেলল, দড়ি দিয়েই হোক, টুকরো কাঠ জুড়েই হোক, হাত মেপেই হোক, —সমকোণ তৈরি করতে ঐ তিন, চার ও পাঁচ সংখ্যা তিনটিই হল দরকারী। সরল রেখা মিলে যে কোণ তৈরি করছে, এটা সেই সরল রেখার ধর্ম, তার 'মাপের' ব্যাপার,—দড়ি টড়ি বা অন্য জিনিসের ধর্ম নয়। গ্রীক ভাবুকদাদারা আরও দেখল, শুধু, ৩, ৪, ৫ কেন, ৫, ১২, ১৩ হাত মাপ নিলেও একই ব্যাপার হবে; একই ব্যাপার ঘটবে যদি দড়িটাকে ৫৬ সমান ভাগে ভাগ করে ৭, ২৪ ও ২৫ ভাগ তিনদিকে সাজিয়ে ত্রিকোণ করি। স্রেফ মাথা খাটিয়েই তারা বার করে ফেলল সেই আজব সম্পর্ক—'সমকোণী' ত্রিভুজের তিনটি বাহু যদি যথাক্রমে a b ও c হয় তবে $a^2 + b^2 = c^2$ হতেই হবে। শুধু ৩,৪,৫ বা ৭, ২৪, ২৫ নয়, অসংখ্য এমন তিন সংখ্যার জুটি নেওয়া যেতে পারে যাদের মধ্যে অঙ্কের ঐ সম্পর্কটি থাকতেই হবে যদি তিনটি সংখ্যার মাপে সরল রেখা দিয়ে সমকোণী ত্রিভুজ বানান যায়! এই ব্যাপারটি ভেবে বার করলেন পীথাগোরাস। এই থেকেই বিজ্ঞান হিসাবে 'জ্যামিতির' সূত্রপাত ঘটল। বোঝা গেল, মাথা খাটিয়ে এরকম মাপজোকের সমস্যার মীমাংসা করা যায়—সাধারণ সম্পর্কওয়ালা সরল আকৃতি কল্পনা করা যায়, যেমন বৃত্ত, ত্রিভুজ, বর্গক্ষেত্র ইত্যাদি যাদের চেহারা অঙ্কের নিয়মে বাঁধা। জ্যামিতিকে একটা সূক্ষ্ম বা abstract বিজ্ঞানের রূপ দিলেন ইউক্লিড।

পীথাগোরাস জন্মেছিলেন গ্রীসের স্যামোস শহরে, খৃস্টজন্মের ৫৮২ বছর আগে। তাঁর সম্বন্ধে খুব বিশেষ কিছু জানা যায় না। বোধহয় তিনি মিশরের অনেক জায়গায় ঘুরে টুরে ছিলেন। পলিক্রেটিস্ নামের এক অত্যাচারী গ্রীক রাজা পীথাগোরাসকে নির্বাসিত করেছিলেন। বেচারি দক্ষিণ ইটালীতে পালিয়ে গেলেন। সেখানে কিছু ছাত্রটাত্র নিয়ে অঙ্কের ইস্কুল চালাতে লাগলেন। সেই সেকালে নতুন কিছু বলতে হলে খুবই লুকিয়ে চুরিয়ে একান্ত বিশ্বাসীদের কাছেই তা বলতে হত। সাধারণ মানুষ এইসব 'ভাবুক দাদা'দের অবিশ্বাস করত। পীথাগোরাস তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে চুপি চুপি আলোচনা টালোচনা চালাতেন।

সেই সেকালেই পীথাগোরাস বিশ্বাস করতেন যে পৃথিবী স্থির নেই, তা চলমান,—সূর্যই স্থির। এ কথা নিয়ে পরে পণ্ডিতদের মধ্যে বহু মারামারি হয়ে গেছে। পৃথিবীকে ঘিরে চাঁদ সূর্য যে ঘুরছে না, বরং সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী ও গ্রহেরা ঘুরছে, এই সত্যকে বিশ্বাস করতে পীথাগোরাসের পরেও মানুষের প্রায় দু'হাজার বছর লেগেছে। পীথাগোরাস সেই হদ্দ সেকালেও কিন্তু বলেছিলেন যে গ্রহদের গতিপথ বৃত্তাকার।

মুস্কিল ছিল, গ্রীকরা হাতেকলমে পরীক্ষাটরীক্ষা করত না। তারা শুধু 'মাথা খাটাত'! তাদের কাছে মাথা খাটনই ছিল জীবনের চরম ভালো। দার্শনিক হলেও চোখ খুলে দেখা দরকার, তারা তা বুঝত না। সেখানেই দাঁড়িয়ে গেল গ্রীক বিজ্ঞানের দুর্বলতা। যাই হোক, পীথাগোরাস "ভেবে" বললেন যে যেহেতু গোল জিনিসই সবচেয়ে নিখুঁত, তাই গ্রহদের চলার পথ গোলাকার!

পীথাগোরাসের শিষ্যটিষ্যরা অনেক কিছু আবিষ্কার করেছিল। অপটিক নার্ভের অস্তিত্ব তারা আবিষ্কার করে। সুরেলা শব্দ আর সুরহীন কোলাহলের মধ্যে কি গুণগত তফাৎ, তারও অঙ্কটঙ্ক নাকি পীথাগোরাস করেছিলেন।

যে ছবিটি দেওয়া হল, পীথাগোরাসকে সম্ভবত ঐ রকমই দেখতে ছিল।

বোস ইনসটিটিউট, ৯২, এ, পি, সি, রোড, কলি-৯

কল্প বিজ্ঞানের গল্প

উড়ন্ত প্লেনে আগুনের রহস্য

ডাঃ বৃন্দাবন চন্দ্র বাগচী

পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় পর পর তিনটে এরোপ্লেন আকাশে উড়বার সময় আগুন লেগে পুড়ে গেল কয়েক দিনের মধ্যেই। এর মধ্যে একটাতে ত তিন'শর বেশী মানুষ ছিল। আর এরোপ্লেন ভেঙ্গে পড়া মানেই সবারই মরণ। রেলগাড়ী বা মোটরগাড়ী দুর্ঘটনায় মারা যায় কম জখমই হয় বেশী। কিন্তু এরোপ্লেন দুর্ঘটনায় যদি কেউ বাঁচে তা নিতান্তই আকস্মিক।

সেদিন লাইব্রেরীতে কয়েকজন মিলে খবরের কাগজের এই সংবাদগুলো নিয়ে আলোচনা করছিল। একজন বলল, আমরা যতদূর শুনেছি এরোপ্লেন আকাশে ওড়বার আগে তার সব কলকব্জা বেশ করে পরীক্ষা করে তবে উড়তে দেওয়া হয়। অথচ আকাশে উঠে অল্প সময় বা কিছু সময় পরেই আগুন লাগে কি করে?

আর একজন বলল—সত্যি! কথাটাতে ভাববার বিষয় আছে। এরোপ্লেনে অনেক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি আছে স্বীকার করি কিন্তু তাকে পরীক্ষা করবার জন্যও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতিই ব্যবহার করা হয়। এই পরীক্ষার পরেও ঐ সব যন্ত্রে হঠাৎ এমনই ত্রুটি হয় যে আগুন লেগে যায়! কথাটা কিন্তু সহজ নয়।

ঘরের এক কোণে আমি বসে খবরের কাগজ পড়ছিলাম। ওদের আলোচনা কানে যেতে মনে ভেসে এল আট বছর আগের পরিচিত আফগান পাইলট জাভেরীর কথা। তবে কি জাভেড়ী যা বলেছিল তাই ঠিক? লোকে ওকে পাগল বলে ওর কথা উড়িয়ে দিয়েছিল কিন্তু ওর কথা উড়িয়ে দেবার মত ছিল না।

ব্যাপারটা তাহলে খুলে বলি।

১৯৭২ সালে সোভিয়েত সরকারের আমন্ত্রণে সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি হয়ে রাশিয়া যাচ্ছিলাম। দিল্লী থেকে এরিয়ানা আফগান লাইনের এরোপ্লেনে নামলাম কাবুলে। এই ফাঁকে কাবুল শহরটা দেখে ফেলব মনে করে যাত্রাভঙ্গ করে একদিন কাবুলে থেকে গেলাম।

দুপুর বেলায় এক বেশ লম্বা-চওড়া চেহারার আফগান এসে বলল, তুমি কি ভারতবাসী? আমি হাঁ বলতে ও আমার হাত দুখানা নিজের হাতে নিয়ে কপালে ঠেকাল। তারপর বলল—আজ রাতে তুমি আমাকে খাওয়াও। কোনও সুখাদ্যের দরকার নেই, যাতে তোমার কষ্ট না হয়, যা তুমি ভাল মনে দিতে পার এমন কিছু খাওয়ালেই চলবে।

ওর কথায় একটা সহজ এবং করুণ আবেদন ছিল—আমি স্বীকার করলাম। ও তখন বলল, তুমি এখন বিশ্রাম কর। বিকালে আমি আসব, কাবুল শহরটা একটু ঘুরিয়ে দেখাব।

ও চলে গেলে ম্যানেজারকে বললাম লোকটা কে?

ম্যানেজার বলল—ওর নাম জাভেরী। এরোপ্লেনের পাইলট ছিল। হঠাৎ একবার ওর প্লেন ধ্বংস হয়ে যায়। সবাই ধরে নিয়েছিল ও মরে গেছে। বছর খানেক বাদে ও কোথা থেকে ফিরে এল। তারপর থেকে সবাইকে এক ভুতুড়ে গল্প শোনাতে লাগল। ঐ গল্প শুনে সবাই ধরে নিয়েছে ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। টাকা-পয়সা যা সরকার থেকে পেয়েছিল তাই দিয়ে ওর বৌ-ছেলে-মেয়ের কোনভাবে চলে ও এদিক ওদিক চেয়ে চিন্তে খায়। আর যার সঙ্গে পরিচয় হয় তাকেই এই ভুতুড়ে গল্প শোনায়।

আমি বললাম—ও যে আমাকে সঙ্গে নিয়ে কাবুল শহর দেখাবে বলল।

ম্যানেজার বলল, তা যেতে পারেন। সেদিক দিয়ে কোনও ভয় নেই। লোকটা ভাল শিক্ষিত। নামকরা পাইলট ছিল। অন্য কোন ভয় নেই। আমি বললাম—না ভয়ের কথার জন্যে নয়, কাবুলে নামা অবধি ট্যাকসিওয়ালা থেকে শুরু করে আর এক হোটেলওয়ালা পর্যন্ত যে ভাবে ঠকাচ্ছিল তাতে ভয় ধরে গেছে। তবে আপনি যখন বলছেন তখন নিশ্চয়ই ভয় নেই।

বিকেলে জাভেরী এল। নভেম্বর মাস, বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে, হেঁটে বেড়াতে ভালই লাগছিল।

এদিক ওদিক ঘুরে জাভেরী বলল, চল ঐ পার্কটায় বসি। তোমাকে আমার জীবনের একটা ঘটনা শোনাব।

আমি ত ম্যানেজারের কাছে আগেই শুনেছিলাম। বললাম, তোমার পাইলট জীবনের কাহিনী ত। জাভেরী একটু দুঃখিত হল,। বলল—নিশ্চয়ই ম্যানেজার তোমায় বলেছে। আর এও বলেছে যে জাভেরীর মাথা খারাপ হয়েছে। ও লোককে বানানো গল্প শোনায়।

আমতা আমতা করে বললাম, অনেকটা তাই বটে।

জাভেরীর মুখখানা কেমন করুণ হয়ে গেল, গলার আওয়াজটা ভারী হয়ে গেল। বলল, তুমি বিশ্বাস কর যে আমার মাথা খারাপ হয় নি। বা বানানো গল্পও বলছি না কিছু। মুস্কিল কি হয়েছে জান, আমার কাহিনী কেউ বিশ্বাস করছে না অথচ উড়িয়ে দেবার মত যুক্তিও দেখাতে পারে না কাজেই তদন্তও করে না।

আমি বললাম—আচ্ছা, আমায় বল আমি নিশ্চয়ই ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করব। আর খোলা মন নিয়ে বিচার করব।

জাভেরী বলল, তাহলে সব ঘটনাটুকুই শোন। মনে হচ্ছে তোমার দিল দরাজ আর মেজাজটাও মোহব্বাতে ভরা। তোমার কাছে বলে আমি আমার দিলটা হালকা করতে পারব।

আমি দরকার মত লেখাপড়া জানি। মানে পাইলট হবার জন্য যতটুকু লেখাপড়ার দরকার তা করেছি। পুশতু ভাষা ছাড়া ইংরেজী এবং রুশ ভাষাও কিছু জানি। পাইলট হবার ট্রেনিং আমার রাশিয়াতে। পুরোপুরি ট্রেনিং নিয়ে ১৯৫৮তে আমাদের দেশে এরিয়ানা আফগানে চাকুরী নিই। একটানা সাত বছর আমি এরোপ্লেন চালিয়েছি খুব আনন্দে। কোনও দিন কোনও দুর্ঘটনা ঘটে নি, এতটুকু বেসামাল হয় নি আমার প্লেন। কিন্তু যে দুর্ঘটনা নিয়ে এই কাহিনী তা ঘটল ১৯৬৫-র এক গ্রীষ্মের দিনে। পঁচিশ জন বিশিষ্ট লোক নিয়ে যেতে হবে নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে, হিমালয়ের উপর দিয়ে উড়তে হবে। খুব দায়িত্বের ব্যাপার। আমিই ছিলাম ঐ লাইনে সবচেয়ে অভিজ্ঞ পাইলট। কাজেই আমাকে ঐ দায়িত্বের জন্য বাছাই করা হল।

পঁচিশ জন বিশিষ্ট লোক যাচ্ছে কাজেই উড়বার আগে প্লেনকে তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করা হল। তোমাদের দেশের কাশ্মীর প্রিন্সের দুর্ঘটনার কথা সবারই মনে ছিল। বান্দুং সম্মেলনে চীনা প্রতিনিধিদের নিয়ে যেতে বোমা ফেটে সমুদ্রে ভেঙ্গে পড়ে। নিতান্তই সমুদ্রে পড়েছিল বলে ক্যাপ্টেন দীক্ষিত আর ক্যাপ্টেন জাতার বেঁচে গিয়েছিলেন! সেই ভেবে টাইম বোমা আছে কিনা যন্ত্রপাতি দিয়েই খোঁজা হল। সব বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আকাশে উড়লাম।

এরোপ্লেন চলছে হিমালয়ের বরফ ঢাকা শৃঙ্গগুলির উপর দিয়ে। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম দিক বোঝাবার কম্পাসের কাঁটা কেমন ঘুরছে। আর উচ্চতা মাপবার মিটারটা ওঠানামা করছে। মনে ভয় হল, কণ্ট্রোল টাওয়ারকে জিজ্ঞাসা করলাম—আমি কি রাস্তা হারিয়েছি, না নামা-ওঠা করছি। উত্তর এল না ঠিক রাস্তায় ঠিক ভাবেই চলছ। ঠিক ভাবেই যদি চলি তবে এগুলো এমন করছে কেন? এই কথা ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ সব রকমের মিটারগুলো কেমন পাগলের মত ওঠানামা ঘোরাঘুরি করতে সুরু করল। আমি ভয় পেয়ে ইমার্জেন্সি দরজাটা খুললাম। জিজ্ঞাসা করব কণ্ট্রোল টাওয়ারকে, ঠিক সেই মুহূর্তে একটা বিদ্যুৎ ঝিলিকের মত কি যেন হল, সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিনের সামনে আগুন লেগে গেল। একটা প্রচণ্ড শব্দ হয়ে এরোপ্লেন দুটুকরো হয়ে গেল, আমিও একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে ইমার্জেন্সি দরজা দিয়ে ছিটকে পড়লাম আকাশে নিরাশ্রয় হয়ে। তারপর অন্ধকার। কখন যে জ্ঞান হল তা বলতে পারব না। চেয়ে দেখলাম খুব ঠাণ্ডা জায়গাতে কম্বলের বিছানায় কম্বল চাপা দিয়ে শুয়ে আছি। চোখ মেলে দেখলাম, জায়গাটা পাহাড়ের গুহা মনে হল। কোণে একটা কিসের যেন প্রদীপ জ্বলছে। হঠাৎ কোণ থেকে পুশতু ভাষায় কে যেন জিজ্ঞাসা করল—এখন কেমন বোধ করছ। তখনও আমার ঠিক জ্ঞান হয় নি, সব যেন স্বপ্নের ঘোরের মত লাগছিল। কিছু না বুঝেও বললাম ভালই।

তখন মানুষটি বলল, তুমি এরোপ্লেনে ছিলে মনে পড়ে?

এবার মনে পড়ল—তাইত আমি ত এরোপ্লেনে ছিলাম, তাতে আগুন লেগেছিল। কিন্তু আমি বাঁচলাম কি করে? এরোপ্লেনে আগুন লাগলে কেউত বাঁচে না আর যদি ছিটকেই পড়ে থাকি তবে উঁচু থেকে পাহাড়ের উপর পড়লেই বা বাঁচলাম কি করে?

আমার মনের কথা ধরে নিয়ে লোকটা হাসতে হাসতে বলল—ঠিক কথা, বাঁচবার কথা নয় কিন্তু বেঁচেছ এও ঠিক। যাই হোক এইটুকু খেয়ে নাও ভাল বোধ করবে।

কিসের যেন পাত্রে গরম গরম কিছু দিল, চুমুক দিয়ে খেয়ে শুয়ে পড়লাম। ও বলল, আরও খানিকটা ঘুমাও পরে সব কথা হবে।

কতদিন যে ঐ গুহায় ছিলাম জানি না, চারদিকে বরফ ঢাকা পাহাড়। দিন রাত্রি একটা সাদা আলোর মত মনে হত। লোকটার চেহারা সন্ন্যাসীর মত। সাদা জটা, সাদা দাড়ি, সামান্য কাপড় পরা। গায়ে কখনও একখানা কাপড় জড়াতো, কখনও খালি গায়েই থাকত। আমাকে বলেছিল বেরিয়ে কোনখানে চলে যাওয়ার চেষ্টা করো না, পথ হারিয়ে বরফে জমে যাবে। শুধু দুইতিনটে

জায়গা দেখিয়ে দিয়েছিল প্রাকৃতিক কাজ সারবার জন্য। সন্ন্যাসী কিন্তু ঐ বরফের উপর দিয়ে কোথায় চলে যেত। আর নানা রকমের খাবার এনে দিত। সেগুলো যে কি তাও বলতে পারব না।

একদিন সন্ন্যাসী আমায় বলল তোমার এরোপ্লেন ভাঙ্গল কি করে?

আমি বললাম—আগুন লেগে।

—কেমন করে আগুন লাগল?

—তা'ত বলতে পারব না।

সন্ন্যাসী হাসতে লাগল, বলল—তুমি লক্ষ্য করেছ আকাশে উড়ন্ত অবস্থায় যে এরোপ্লেনগুলো ধ্বংস হয় প্রায় সব কটাই আগুন লেগে হয়। অথচ উড়বার আগে সব পরীক্ষা করেও যন্ত্রে কিছু গোলমাল যে আছে তা বোঝা যায় না।

আমি চিন্তা করে বললাম—হ্যাঁ, আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে তাই বটে। ব্যাপারটা যেন হঠাৎই ঘটে।

তোমার ত অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে বলতো আগুন লাগবার আগে কি ঘটে।

হ্যাঁ, অভিজ্ঞতা হয়েছে, আগুন লাগবার আগে সব মিটারগুলো কেমন পাগল হয়ে গেল।

সন্ন্যাসী—এরকম পাগলামো আর কখনো দেখেছ?

আমি চিন্তা করে বললাম, দেখেছি তবে এতটা নয়!

সন্ন্যাসী বলল—হাঁ, এতটা হলে ত আগুনই লাগত। আর এর চেয়ে অল্প কম হলেও ত ক্ষতি হত।

আমি বললাম—দু' একবার দেখেছি এরোপ্লেন নেমে পড়তে চায়, ঘুরে যেতে চায় কিন্তু সামলে নেওয়া যায়।

সন্ন্যাসী এবার বলল—দেখ তুমি যা দেখেছ আগুন লাগা এরোপ্লেনগুলোর সব 'পাইলটই তাই দেখে কিন্তু এসব বিবরণ দেবার জন্য কেউ ত বেঁচে থাকে না। ভগবানের দয়ায় তুমি বেঁচে গেছ।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম—আমি কি করে বাঁচলাম!

সন্ন্যাসী দু'হাত বাড়িয়ে বলল—ধরে নাও আমি লুফে নিয়েছিলাম।

সে কি? অত উঁচু থেকে লুফে নিলেন? কেমন করে?

সে কথা নাই বা শুনলে, তোমার জানবারই বা দরকার কি? বেঁচে যে আছ এটা ত সত্যি? তবে এই আগুন লাগবার রহস্যটা তোমাকে আজ বলব।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম—আপনি এই আগুন লাগবার কারণ জানেন?

হ্যাঁ, জানি বলেই ত তোমাকে বলছি, শোন। দেখ আমাদের এই সূর্য আর তার চারপাশে যে গ্রহ উপগ্রহ ঘুরছে এছাড়াও এই সীমাহীন ব্রহ্মাণ্ডে অনেক অনেক সূর্য আছে। আর এইসব সূর্যকে ঘিরে অনেক অনেক গ্রহ উপগ্রহও নিশ্চয়ই আছে। এইসব অসংখ্য গ্রহ উপগ্রহের মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু কিছু গ্রহের মধ্যে নানা রকম প্রাণী আছে। এই প্রাণীদের মধ্যে বুদ্ধিমান প্রাণীও নিশ্চয় আছে। এমনও নিশ্চয় আছে যারা মানুষের চেয়েও বুদ্ধিমান, এত বুদ্ধিমান যে আমরা পৃথিবীর মানুষেরা তাদের বুদ্ধি এবং বিজ্ঞানে উন্নতি কল্পনাও করতে পারি না।

...ধরে নাও আমি লুফে নিলাম

সেই সব বুদ্ধিমান এবং বিজ্ঞানে উন্নত জীবেরা মাঝে মাঝেই খোঁজ খবর নেবার চেষ্টা করে যে এই ব্রহ্মাণ্ডে আর কোন গ্রহে বুদ্ধিমান জীব আছে কিনা। কিন্তু উপায় কি? জানবার উপায় হচ্ছে সংকেত পাঠানো। কোটি কোটি মাইল দূর থেকে সংকেত পাঠানো সহজ কথা নয়। শব্দ তরঙ্গ সৃষ্টি করে পাঠালে অনেক দূর থেকে আসতে আসতে ও তরঙ্গ হয়ত মিলিয়ে যাবে তাই ওরা চেষ্টা করে আলোর তরঙ্গের মধ্যে দিয়ে সংকেত পাঠাতে। আমরা পৃথিবীর মানুষেরা যে সব আলোর কথা জানি তারা তার চেয়েও অন্য রকম রশ্মির কথা জানে। ওরা তাই দিয়ে ব্রহ্মাণ্ডে সংকেত ছড়িয়ে দেয়। অপেক্ষা করে কোনও জায়গা থেকে ঐ সংকেতের উত্তর পাওয়া যায় কিনা। এত বড় ব্রহ্মাণ্ডে কত কোটি সূর্য, কত কোটি গ্রহ আছে। নিশ্চয়ই কোনও খান থেকে ঐ সব সংকেতের উত্তর যায়। এইভাবে নানা ধরনের রশ্মি দিয়ে সংকেত চালাচালি হয়। আমরা পৃথিবীর মানুষেরা

নিজেদের যত বুদ্ধিমান বলে অহংকার করি না কেন ঐ সব সংকেত যে আসে বা ঐ সংকেতের ভাষা কি তা ধরবার মত বুদ্ধিই আমাদের গজায়নি। কাজেই এ কথাটা অজানাই রয়ে গেছে।

এখন কথা হচ্ছে এই যে নানা রকমের রশ্মি নানা রকমের তরঙ্গ তুলে মহাকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং কোন কোনটার এমন ক্ষমতা আছে যে পৃথিবীর আবহমণ্ডলীতে ওলট-পালট ঘটাতে পারে। যন্ত্রপাতি বিগড়ে যেতে পারে, ঝড়-বাদল বৃষ্টি করতে পারে।

এই রকম সংকেত রশ্মির পথে যদি কোনও এরোপ্লেন এসে পড়ে তাহলে হয়ত ঐ তরঙ্গের ধাক্কায় তার যন্ত্রপাতি বিগড়ে যেতে পারে। অল্প স্বল্প রকমের এবং বেশী বিপজ্জনক ধাক্কা না হলে যন্ত্রপাতি অল্প বিগড়ায়। পাইলট হয়ত বুদ্ধি করে এরোপ্লেন মাটিতে নামিয়ে ফেলে কিন্তু মারাত্মক ধরনের তরঙ্গের পাল্লায় পড়লে এরোপ্লেনে আগুন লেগে যায়। কিন্তু মুশকিল কি জান, আগুন লাগবার আগে বা পরে কি কি ধরনের কাণ্ডকারখানা দেখা যায় তা বলবার জন্য কেউই বেঁচে থাকে না। তাই গোটা ব্যাপারটা অজানা থেকে যায়। তদন্ত হয়, তাতে বলা হয় হঠাৎ যন্ত্র বিগড়ে গিয়েছিল।

আমি বললাম—হ্যাঁ, আগুন লাগবার আগে যে কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার ঘটে তা ত দেখলামই। এছাড়া টাল খাওয়া বা অল্প কিছুর উপর দিয়ে মিটে যাওয়ার ব্যাপারও দু' তিনবার দেখেছি, তাহলে এর প্রতিকার কি?

সন্ন্যাসী বলল—প্রতিকারের উপায় ত কিছু দেখছি না। ঐসব শক্তিশালী রশ্মির নামও ত পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা জানে না, ঠেকাবে কি করে। তাছাড়া এ ধরনের ব্যাপার যে ঘটতে পারে এ ধারণাও ত কারও নেই।

আমি বললাম, আপনি টের পান?

সন্ন্যাসী বলল—তা পাই তবে পেয়েই বা কি করব।

আমি বোকার মত বসে রইলাম।

সন্ন্যাসী বলল—তোমার ঐ এরোপ্লেনের কেউই আর বেঁচে নেই। ওটা টুকরো টুকরো হয়ে হিমালয়ের উপর পড়েছে। তোমার প্রভুরা ধরে নিয়েছে তুমিও মরে গেছ। যাই হোক অনেক দিন এখানে থাকলে। মুখে না বললেও বুঝতে পারছি বাড়ীর জন্য তোমার মনটা উতলা হয়েছে। তোমাকে বাড়ী পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হয়।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কেমন করে পাঠাবেন?

সন্ন্যাসী বলল, সে খবর নাই বা জানলে। বাড়ী পৌঁছোলে তুমি নিশ্চয়ই খুশী হবে।

তা হব—আমি হেসে বললাম, কিন্তু একটা কথা বলব—আপনি কি আফগান?

—কেন বলত?

আপনি আমার সঙ্গে পুশতু ভাষায় কথা বলেন, আর কি ভাষা আপনি জানেন?

সন্ন্যাসী বলল—না, আমি ভারতবর্ষের মানুষ। তবে যে কোনও মানুষ আমার সামনে এলে তার ভাষায় কথা বলতে পারি।

রাত্রিতে আমার গুহাতে শুতে যাবার আগে সন্ন্যাসী আমাকে কি যেন খেতে দিল। বলল, এটা খেয়ে ঘুমিয়ে নাও। অনেক রাস্তা যেতে হবে, গায়ে জোর করে নাও। আমি সন্ন্যাসীর কাজকর্ম দেখে এত বাধ্য হয়েছিলাম যে তার কথা মত জিনিসটা সবটুকু খেয়ে ফেললাম। ঘুমিয়েও পড়লাম।

ঘুম থেকে উঠে চমকে গেলাম। কোথায় গুহা, কোথায় সন্ন্যাসী, কোথায় সেই বরফ ঢাকা হিমালয়। আমি আমার গ্রামের বাড়ীর ফটকে শুয়ে আছি। ধীরে ধীরে উঠে বসলাম। দেখলাম আমার চেহারার পরিবর্তন হয়েছে। মুখ ভর্তি দাড়ি গোফ, পোষাক ছেঁড়া, চুল বড়। আস্তে আস্তে বাড়ীর ভিতর ঢুকে আমার স্ত্রীর নাম ধরে ডাকলাম। আমার ছেলে বেরিয়ে এল। একে আমার ঐ চেহারা তার উপরে আমি মরে গেছি বলে সবাই জানে, কাজেই ও আমাকে চেনবার চেষ্টা না করে বাড়ীর ভিতরে গিয়ে আমার স্ত্রীকে বলল—একজন লোক তোমায় ডাকছে।

স্ত্রী বাইরে এলে আমি তার দিকে চেয়ে রইলাম বললাম—আমি জাভেরী। তার পরের ব্যাপার আর বলে কি করব। কান্না হাসি হৈ চৈ এই সব নিয়ে দু'চার দিন কাটল তারপর আমার অফিসে গিয়ে হাজির হলাম। আমার বড় কর্তারা আমার বাঁচার গল্প শুনল, সন্ন্যাসীর কথা শুনল। তারপর বলল, জাভেরীর মাথা খারাপ হয়েছে। ও সকলকে ভুতুড়ে গল্প শোনাচ্ছে।

আমার সবচেয়ে বড় দুঃখ—আমার কাহিনী ওরা বিশ্বাস করল না।

এই বিশ্বাস করে ওরা যদি সারা পৃথিবীকে জানাত তবে উন্নত দেশগুলি থেকে হয়ত একটা তদন্ত হতে পারত। এমনও হতে পারত যে এই তদন্তের ফলে অনেক এরোপ্লেন আগুন লাগার হাত থেকে বেঁচে যেত।

আমি জাভেরীর কথা অবিশ্বাস করতে পারি নি। এখনও এরোপ্লেনে আগুন লাগবার কথা পড়লেই জাভেরীর কথা আমার মনে হয়।

পোঃ রায়গঞ্জ, পঃ দিনাজপুর

কণ্ট্যাক্ট লেন্স

সমীরকুমার ঘোষ

মানুষের দৃষ্টিশক্তির ত্রুটিমুক্তির জন্যই চশমা ব্যবহার করা হয়। সাধারণভাবে প্রচলিত চশমা ব্যবহারের সুবিধাও যেমন অনেক, অসুবিধাও তেমন বেশ। এই অসুবিধার কথা চিন্তা করেই, আজ থেকে প্রায় একশ' বছর আগে চশমার বিকল্প হিসাবে 'কণ্ট্যাক্ট লেন্স'-এর প্রথম উদ্ভব হয়েছিল। বস্তুতঃ, কণ্ট্যাক্ট লেন্স জিনিসটা কি? চশমার কাচের মতই, কাচের খুব ছোট্ট আকারের একটি লেন্সকে চোখের খুব কাছে রেখে, চশমার মতই কাজ করানো যায়। এই ছোট্ট লেন্সকেই 'কণ্ট্যাক্ট লেন্স' বলে। আজ থেকে প্রায় ৫০ বছর আগে, ১৯৩০ সালে প্রথম কণ্ট্যাক্ট লেন্সের নকসা নিয়ে গবেষণা সুরু হয় এবং এর সার্থক রূপায়ণ ঘটে ১৯৪৮ সালে, যখন টুহি নামে এক বিজ্ঞানী এই আশ্চর্যজনক লেন্সের সার্থক ব্যবহার দেখান। এই প্রয়াসের ফলেই এখন প্রায় পৃথিবীর লক্ষাধিক লোক এই লেন্স একটানা ১০।১২ ঘণ্টা পরে থেকে অক্লেশে কাজ করতে সক্ষম হচ্ছেন।

কণ্ট্যাক্ট লেন্স সাধারণতঃ তিন প্রকারের হয়। (১) কর্নিয়াল কণ্ট্যাক্ট লেন্স—যা চোখের কর্নিয়া বা অচ্ছোদপটলের প্রায় সমস্ত অংশটাই আবৃত করে রাখে; (২) স্ক্লেরাল কণ্ট্যাক্ট লেন্স—যা স্ক্লেরা বা চোখের সামনের সমস্ত অংশটাই আবৃত করে রাখে; এবং (৩) কর্নিয়াল লেন্সের চেয়ে আকারে একটু বড় লেন্স যাদের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত অনেক কম।

কণ্ট্যাক্ট লেন্স সাধারণতঃ কাচেরই হয়। কিন্তু বর্তমানে এক বিশেষ ধরনের প্লাস্টিকের তৈয়ারী লেন্সও পাওয়া যায়। এই বিশেষ প্লাস্টিকের নাম 'পলিমিথাইল মিথাক্রাইলেট পারস্পেকস্'। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আজকাল সফ্‌ট্ প্ল্যাস্টিক-এর লেন্সও ব্যবহার করা হচ্ছে। কর্নিয়া বা অচ্ছোদপটলের আলোক-ঘনত্ব বা Optical density এবং কণ্ট্যাক্ট লেন্স যে পদার্থ দিয়ে তৈয়ারী হয়, তার আলোক ঘনত্ব প্রায় একই মানের রাখা হয়। ফলে, প্রতিসরণের দরুন আলোকরশ্মি প্রায় একই সরলরেখায় থাকায়, এই লেন্স ব্যবহারের সময়ে লক্ষ্যবস্তু ও প্রতিবিম্বের মধ্যে কোনপ্রকার দৃষ্টিভ্রমের সৃষ্টি হয় না। সাধারণতঃ, এই লেন্সের গড় ব্যাস ৮½ মিলিমিটার থেকে ১০ মিলিমিটার মত হয় এবং গড়বেধ ১ মিলিমিটারের ১০ ভাগের ২ অথবা ৩ ভাগের মত হয়।

অনেকেই হয়ত ভাবে যে, চশমার মত ফ্রেম ছাড়াই এই লেন্স চোখে যথাযথভাবে আটকে থাকে কিভাবে? প্রকৃতপক্ষে, পৃষ্ঠটান বা Surface tension এবং কৈশিক প্রক্রিয়া বা Capillary action-এর জন্যই এই লেন্স চোখে আটকে থাকে। এ ব্যাপারে চোখের পাতাও বেশ এক সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। লেন্স ও কর্নিয়ার মাঝে যে 'ল্যাক্রিমাল ফ্লুইড' নামে একপ্রকার তরল পদার্থের পাতলা স্তর চোখের মধ্যে থাকে, তার জন্যই কৈশিক প্রক্রিয়া ও পৃষ্ঠটানের উদ্ভব হয় এবং লেন্সটি চোখের মধ্যে যথাযথভাবে সুন্দর আটকে থাকে। সত্য কথা বলতে কি, কণ্ট্যাক্ট লেন্স কখনো চোখের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে থাকে না। এখন, প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এই কণ্ট্যাক্ট লেন্স ব্যবহারের সুবিধা ও উপকারিতা কি। অপেক্ষাকৃত কম মাত্রার ত্রুটিযুক্ত দৃষ্টিশক্তি সংশোধন করার জন্য চশমা অপেক্ষা কণ্ট্যাক্ট লেন্সের ব্যবহার অনেক বেশী উপকারী। কম মাত্রার myopia বা নিকট-দৃষ্টি দোষযুক্ত চোখের ক্ষেত্রে, কণ্ট্যাক্ট লেন্স ব্যবহার বিশেষ উপযোগী এবং চক্ষু চিকিৎসকদেরও সেরূপ অভিমত। পুরু লেন্সযুক্ত চশমা ব্যবহার করলে, অনেক সময়ে কার্যকরী দৃষ্টিশক্তি যেমন কমে যায়, তেমনি প্রতিসরণ সংক্রান্ত আলোকরশ্মির বিচ্যুতির ফলে, লক্ষ্যবস্তু সম্বন্ধে অনেক সময়ে দৃষ্টিভ্রমও জন্মায়। এসব ক্ষেত্রে, কণ্ট্যাক্ট লেন্সের ব্যবহার সর্বোতোভাবে শ্রেয়। এছাড়া, এই লেন্স ব্যবহারের আরো একটা সুবিধা এই যে, এই লেন্স চোখ নড়াচড়া করার সঙ্গে সঙ্গে তাল রেখে নড়াচড়া করতে সক্ষম। দৃষ্টি বৈষম্য বা astigmatism দোষও কণ্ট্যাক্ট লেন্সের সাহায্যে অতি নিপুণভাবে সংশোধন করা যায়। অনেক সময়ে আবার দেখা যায় যে, কারো কারো দু'চোখে হয়ত দুই রকমের ত্রুটি—অর্থাৎ একচোখে হয়ত myopia এবং অন্যচোখে হয়ত astigmatism। এই সব ক্ষেত্রে সাধারণ চশমা ব্যবহার ক'রে ত্রুটি সংশোধন অনেক সময়েই ফলপ্রসূ হয় না, কারণ একই বস্তুর দুইটি বিভিন্ন আকৃতির প্রতিবিম্ব তৈরী হ'য়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে একমাত্র কণ্ট্যাক্ট লেন্সের সাহায্যেই সংশোধিত দৃষ্টিশক্তি উৎপন্ন করা সম্ভব।

আবার বিভিন্ন ধরনের চক্ষুরোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার ব্যাপারেও কণ্ট্যাক্ট লেন্সের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। চোখের প্রায় সংস্পর্শে থাকার দরুন, এই লেন্স

প্রায় এক ধরনের চক্ষু আচ্ছাদনের মতই কাজ করে। যার ফলে চোখ, বহু সংক্রামণের হাত থেকে এই লেন্সের প্রভাবে রক্ষা পায়। খেলাধূলা সংক্রান্ত ক্ষেত্রেও এই লেন্স এক বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। ক্রিকেট, ফুটবল ইত্যাদি ধরনের খেলাতে, যেখানে তীক্ষ্ণদৃষ্টির প্রয়োজন অথচ চশমা পরে খেলা বিপজ্জনক, সে সব ক্ষেত্রে খেলোয়াড়দের পক্ষে কণ্ট্যাক্ট লেন্সই একমাত্র সহায়। পৃথিবীর বহু প্রথম সারির ক্রিকেট খেলোয়াড় কণ্ট্যাক্ট লেন্স পরে ক্রিকেট খেলেন—যা দর্শকরা হয়ত জানতেই পারে না। এছাড়াও, আরো একটা সুবিধা এই যে, এই লেন্স জলে ভিজে বা কুয়াশা-বাষ্পে ঝাপসা হয়ে গিয়ে দৃষ্টিশক্তিকে অস্পষ্ট করে তোলে না। এই প্রসঙ্গে একটা বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কর্নিয়া বা অচ্ছোদ-পটলের কোষগুলি, বাতাসের অক্সিজেনের সাহায্যেই প্রধানতঃ জৈবক্রিয়া সম্পন্ন করে। বাতাসের অক্সিজেন চোখের জলের মধ্যে দ্রবীভূত হয় এবং এই চোখের জলই (অশ্রু) প্রতিনিয়ত অচ্ছোদপটলকে সিক্ত করে, কোষের প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সরবরাহ করে। সেজন্য মনে হতে পারে যে, কণ্ট্যাক্ট লেন্স যদি অচ্ছোদপটলকে ঢাকা দিয়েই রাখে, তবে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সংগ্রহ হয় কিভাবে? আসলে কর্নিয়াল কণ্ট্যাক্ট লেন্সের ব্যাস সাধারণতঃ কর্নিয়ার ব্যাসের $\frac{1}{3}$ ভাগ হয় এবং লেন্সটি অক্সিজেনযুক্ত চোখের জলের পাতলা স্তরের ওপর ভেসে থাকে বলে, কোষগুলি সহজেই বাতাস থেকে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সংগ্রহ করতে পারে।

কণ্ট্যাক্ট লেন্স ব্যবহারের সুবিধাও যেমন অনেক, অসুবিধাও তেমনি প্রচুর। এই লেন্স যেমন চোখকে অনেক মারাত্মক রোগ থেকে রক্ষা করে, তেমনি আবার নানা চক্ষুরোগের সৃষ্টিও এই লেন্স করতে পারে। এইসব রোগ চোখের পাতায় বা কর্নিয়াতে হয়। বাতাসের অতিরিক্ত তাপমাত্রায় বা অত্যন্ত ধূলামিশ্রিত আবহাওয়াতে কণ্ট্যাক্ট লেন্স ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। শারীরিক অসুস্থতা, অসহিষ্ণুতা, চর্মরোগ প্রভৃতি ব্যাপার কণ্ট্যাক্ট লেন্স ব্যবহার করার পক্ষে বিশেষ অন্তরায় হ'তে পারে। সেজন্য এই লেন্স ব্যবহারকারীদের কিছু সহিষ্ণুতা ও প্রয়োজনীয় দক্ষতা থাকা প্রয়োজন। অনুপযুক্ত আকারের লেন্স ব্যবহারে অথবা যখন তখন, যেমন তেমনভাবে লেন্স চোখ থেকে খোলাপরা করলে, অনেক ক্ষেত্রেই ব্যবহারকারীর পক্ষে এই লেন্স ব্যবহার করার বিশেষ অসুবিধা দেখা দিতে পারে। সেজন্য, সহিষ্ণুতা এই লেন্স ব্যবহারকারীদের পক্ষে এক বিশেষ গুণ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। এছাড়াও, এই লেন্স একটানা ঘণ্টার পর ঘণ্টা পরে থাকার ফলে অনেক সময়ে এর চাপে, স্ট্রোমা' অথবা 'কেরাটিসিস্' নামে চক্ষুরোগের সৃষ্টি হ'তে পারে। সুতরাং ব্যবহারকারীদের বিশেষভাবে জেনে নিতে হয়, কিভাবে কণ্ট্যাক্ট লেন্স খুলতে ও পরতে হয়। অযত্ন সহকারে পরার ফলে, বহু সময়ে চোখে ক্ষতেরও সৃষ্টি হ'তে পারে। সেজন্য, এই লেন্স ব্যবহারকারীদের বিশেষভাবে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। সবশেষে মনে রাখতে হবে যে, যেহেতু কণ্ট্যাক্ট লেন্স চোখে পৃষ্ঠটানের ফলে আটকে থাকে, সেজন্য এই লেন্স পরা অবস্থায় কখনোই ঘুমানো, স্নান করা বা সাঁতার কাটা উচিত নয়।

যাই হোক, এত অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও একথা নিশ্চিত যে, কণ্ট্যাক্ট লেন্স চোখের রোগ নিরাময়ে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। এছাড়াও, রঙ্গীন কণ্ট্যাক্ট লেন্স দৃষ্টিশক্তিহীন, কুৎসিত চোখের সৌন্দর্য ফিরিয়ে এনে মানুষের সৌন্দর্য ও ব্যক্তিত্বকে নিখুঁতভাবে অনেকখানি বাড়িয়ে তুলতেও সমর্থ হয়েছে।

পদার্থবিদ্যা বিভাগ, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
শান্তিনিকেতন, বীরভূম

বিজ্ঞানের টুকিটাকি

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পাখি

বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি আর্জেন্টিনায় এক সুবিশাল প্রাগৈতিহাসিক পাখির জীবাশ্ম আবিষ্কার করেছেন। পাখিটার আকার বিশাল এবং তার ডানার বিস্তৃতি প্রায় পঁচিশ ফুট। মাথা থেকে লেজের দৈর্ঘ্য এগারো ফুট, এবং আনুমানিক ওজন পঁচাত্তর কিলোগ্রাম।

লস এঞ্জেলসের 'ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়াম'-এর তত্ত্বাবধায়ক ডঃ কেনেথ এফ. ক্যাম্পবেল বলেছেন, 'এটাই এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পাখি। যদি আজ এ পাখি বেঁচে থাকতো, তাহলে সে এক দেখবার জিনিস হতো।'

হিন্দু স্কুল সায়ান্স সেণ্টার

কিন্নর রায়

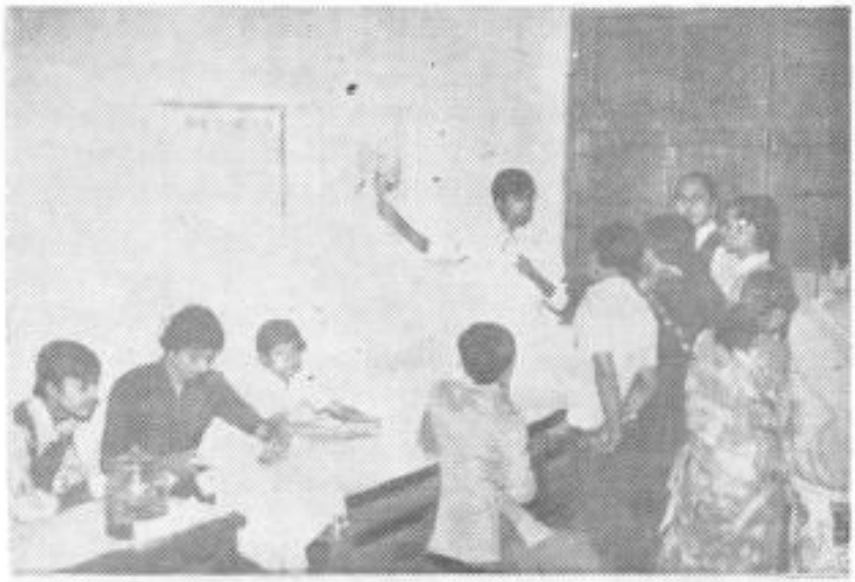

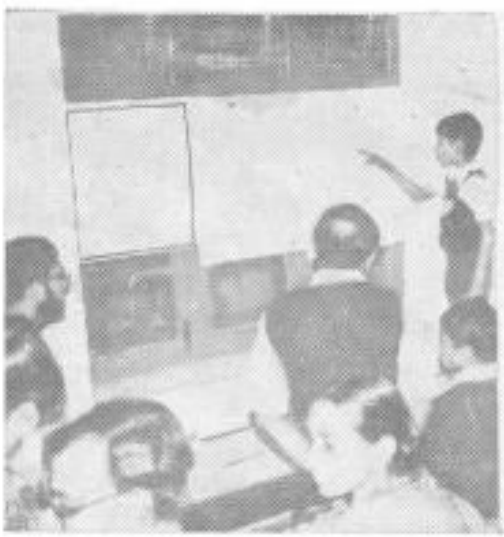

বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে (১৯৮০) অংশগ্রহণকারী ছাত্ররা

১৯৭৯ সালের শেষ দিকে হিন্দু স্কুলের শিক্ষক ছাত্ররা মিলে গড়ে তুলেছিলেন হিন্দু স্কুল সায়ান্স সেণ্টার। এই উদ্যোগের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন এই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র চন্দ্রশেখর রায়। সেণ্টারের ঘর একতলায়।

যারা এখন এই সেণ্টারটি উদ্যোগ নিয়ে চালাচ্ছে, তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল ওয়ার্ক এডুকেশান কোর্সের জন্যে সায়েণ্টিফিক মডেল তৈরী করতে হয়। একাজে মন ভরে না। অনেকে বাড়ি থেকে করিয়ে আনে। বিজ্ঞানকে আরও বেশি বেশি কাছে পাবার জন্যে এই সেণ্টার খোলা হয়েছে। চেষ্টা চলছে বিজ্ঞান-চিন্তাকে আরও বেশি করে কাজে লাগানোর।

সাতটা গ্রুপ করে ছেলেরা কাজ চালাচ্ছে এখানে। এরা হলো - বায়োলজি, কেমিস্ট্রি, ইলেকট্রনিকস, ফিজিকস, ম্যাথমেটিকস, ইলেকট্রিকাল টেকনোলজি, আর জেনারেল ম্যানেজমেণ্ট।

প্রতি গ্রুপেরই একজন লিডার আছে। ক্লাস টেনের দেবব্রত মিত্র ম্যাথমেটিকসের ব্যাপারটা দেখাশুনো করে। ও বললো, এই বিভাগ থেকে কোন্ রাস্তা দিয়ে কত

গাড়ি গেল, তার গড় হিসেব নেয়া হয় কখনও কখনও। এই স্কুলের ছেলেদের উচ্চতার গড় হিসেব রাখা হয়। উষ্ণতার গড়ও কষে ফেলা হয়।

সেন্টারের বায়োলজি বিভাগের কর্তা অমিতাভ মজুমদার জানালো, এখানে মেডিকেল কলেজ থেকে মানুষের ব্রেন এবং লিভার এনে রাখা হয়েছে। প্রজাপতি, ফড়িং ধরে রেখে দেয়ার ব্যবস্থা আছে। অবশ্য সবই মৃত।

১৯৮০ সালে গরমের ছুটিতে ওরা গঙ্গাসাগর গেছল নানারকম বায়োলজিক্যাল স্পেসিমেন সংগ্রহ করতে। কাকদ্বীপও ঘুরে এসেছে। দেখেছে কাকদ্বীপ রিসার্চ ইনস্টিটিউট। মেরিন বায়োলজি ইনস্টিটিউট। সংগ্রহ করেছে শংকর মাছ, সামুদ্রিক সাপ—যার বিষ আছে। হারমিট ক্র্যাব। ওটা কলকাতা পর্যন্ত জ্যান্ত ছিল।

দীঘা থেকে ওরাই নিয়ে এসেছে বাচ্চা হাঙর, অক্টোপাস। সব কিছু রাখা আছে এই সেন্টারে। বায়োলজি বিভাগ থেকে ওরা স্কুল কম্পাউণ্ডে শুরু করেছে এক্সপেরিমণ্টাল গার্ডেনের কাজ। এখানকার গাছপালা থেকে ওরা প্রকৃতির পাঠ নেবে।

ফিজিক্স ডিপার্টমেণ্ট তৈরী করেছে ক্যালিডো-স্কোপ, সিনেমা প্রজেক্টার এবং থিয়ডো-লাইট। থিয়ডো-লাইট মৌলিকত্বের দাবী রাখে বলে ওরা বললো।

ইলেকট্রিকালের প্রসূন সেনগুপ্ত আর অরিন্দম দে জানালো, প্লাগ পয়েণ্ট ফিউজ দিয়ে ওরা বোর্ড বানিয়েছে। কিভাবে বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ তৈরী হয়ে টাওয়ার দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে তার মডেল বানিয়েছে ওরা। মডেলে দেখাতে পেরেছে লোডশেডিং কেন হয়।

ইলেকট্রনিকসের সুব্রত মিত্র বললো, ইনটিগ্রেটেড সার্কিট দিয়ে আইসি এমপ্লিফায়ার তৈরী করা হয়েছে। বানান হয়েছে ডি. সি এলিমিনেটর।

কেমিস্ট্রি বিভাগ তৈরী করেছে কালি, ভ্যানিসিং ইঙ্ক এবং সাবান। বিভিন্ন অঞ্চলের জল সংগ্রহ করে ওরা তার রাসায়নিক বিশ্লেষণ করছে। ক্ষারতা দেখতে চাইছে।

সেন্টারের ছেলেরা স্কুল ছুটির পর একঘণ্টা বা পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময়ের মতো এসব কাজ করে। মাঝে মধ্যে ছুটির দিনেও ওরা সেন্টারে জমা হয়। এ তথ্য ক্লাস টেনের দুর্জয় চৌধুরীর। ও এসব ব্যাপার দেখাশুনো করে।

শ' দেড়েকের মতো বিজ্ঞান বিষয়ক বই আছে এই সেন্টারের লাইব্রেরীতে। তার মধ্যে পড়া এবং রেফারেন্সের বই-ই শ'খানেক। এ খবর দিল সেন্টারের লাইব্রেরিয়ান শিলাদিত্য বসু রায়। সোভিয়েত ইউনিয়নের দূতাবাস ওদের বই পাঠাবে বলে কথা দিয়েছে। বই পাঠিয়েছে একটি জার্মান সংস্থা। 'কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান' সেন্টারের ছেলেরা প্রথম সংখ্যা থেকেই কিনছে। ওদের কথা—কাগজটা দারুণ হচ্ছে।

প্রতি শনিবার এখানে সায়েণ্টেফিক কুইজ কনটেস্ট হয়। ফিজিকসের মাস্টারমশাই শিশির মুখার্জি এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেন। ক্লাস সিক্স থেকে টেন পর্যন্ত ছেলেদের দুটো গ্রুপ আছে। পাস্তুর গ্রুপ আর নিউটন গ্রুপ।

এছাড়া আলোচনা হয় বিজ্ঞানের ইতিহাস নিয়ে। আবিষ্কারের কাহিনীও থাকে এর মধ্যে। অংকের নানান মজার খেলা ওরা খেলে। শেখান হয় টেলিগ্রাম পাঠানোর মোর্স কোড। ডি এক্স বিভাগ থেকে বিদেশী রেডিওর খবর শুনে সেই সেই দেশে তার রিপোর্ট পাঠানো হয়।

বছরে একবার এগজিবিশান হয়। ১৯৮১ সালে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রণ্ট সরকার সেন্টারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। বছরে পাঁচশো টাকা অনুদানের ব্যবস্থা হয়েছে। মাঝে মাঝে সেন্টারের ছেলেদের বাইরে দূরে নিয়ে যাওয়া হয়। আবার আশেপাশের বিড়লা মিউজিয়াম, প্রেসিডেন্সী কলেজের ল্যাবরেটরী ঘুরিয়ে দেখানো হয়। ১৯৮০ সালে ওরা নেহরু চিলড্রেন্স মিউজিয়াম থেকে শ্রেষ্ঠ মডেলের জন্যে প্রথম পুরস্কার পেয়েছে।

ওরা সকলেই বারবার প্রধান শিক্ষক পরেশ চক্রবর্তীর প্রেরণার কথা স্বীকার করে। বহুবার বলে অঙ্কের মাস্টারমশাই অজিতকুমার ঘটক, কেমিস্ট্রি-শিক্ষক স্মরজিৎ রায়, জীবন-বিজ্ঞানের মাস্টারমশাই স্বপন সাহার কথা।

পদার্থবিদ্যার শিক্ষক শিশিরকুমার মুখার্জি, টেকনোলজির শিক্ষক সুরজিত চক্রবর্তীর কথা ওরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করে সব সময়। অধ্যাপক প্রদ্যোত পালের সহায়তা ওদের সমৃদ্ধ করছে।

প্রধান শিক্ষক পরেশ চক্রবর্তী জানালেন, আমাদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে আমরা চেষ্টা চালাচ্ছি। আমার সহকর্মী এবং ছাত্ররা এ ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহী। তবে বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তির কাছ থেকে মূল্যবান উপদেশ ও পরামর্শ আমরা চাই। তাছাড়া বহু জিনিসপত্রও দরকার আমাদের। এ ধরনের সাহায্য কেউ করলে সুবিধেই হবে।

সব মিলিয়ে হিন্দু স্কুলের সায়ান্স সেন্টার কলকাতার গর্ব।

প্রাণীরাও প্রসাধন করে

শ্রীকুমার রায়

শৈশব থেকেই আমাদের উপদেশ দেওয়া হয় রোজ দাঁত মাজতে, গা ঘসে চান করতে, চুল আঁচড়াতে। স্নানের আগে হয়ত আবার কেউ গায়ে ভাল করে তেল মেখে নেয়, কখনও বা শরীরে ক্রিম, ট্যানিং-অয়েল বা পাউডার লাগায়। এই সব কাজগুলিকেই তো আমরা বলি প্রসাধন? আমাদের পরিচিত বহু মেরুদণ্ডী প্রাণীও জলে, ধুলো কাদায় স্নান করে থাকে একই উদ্দেশ্যে। আমরাই যে কেবল সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে বা রাত্রে শুতে যাবার আগে দাঁত মাজি তা নয়, বানরবর্গের অন্য সদস্যরাও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ এবং তর্জনী দিয়ে মাঝে মাঝে নিজেদের কৃন্তক দাঁত পরিষ্কার করে নেয়, শিম্পাঞ্জীরা গাছের ডাল ভেঙে দাঁতন করছে এও দেখা গেছে। কুমিরেরাও ডাঙায় উঠে রোদ পোয়াতে পোয়াতে ছোট ছোট পাখিদের দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করিয়ে নেয়।

শারীরিক প্রয়োজনে প্রসাধন প্রধানত চর্ম বা চুল, নখ প্রভৃতির উপাঙ্গের পরিচর্যায় সীমাবদ্ধ। এককোষী এ্যামিবার কোষ প্রাচীর থেকে শুরু করে সন্ধিপদ প্রাণীদের ক্যারাপেস জাতীয় বহিরাবরণ, কম্বোজ বা নিম্নশ্রেণীর মেরুদণ্ডীদের বহিঃআস্তরণ (খোলস) এবং অন্তঃআস্তরণ (ম্যান্টল্) এবং মনুষ্যাদি উচ্চশ্রেণীর মেরুদণ্ডীদের দুই স্তর বিশিষ্ট চর্মই প্রাণী শরীরকে রোদ, জল, শীতাতপ ধুলা, পোকামাকড়, জীবাণু ইত্যাদি ক্ষতিকারক বহিঃপরিবেশ থেকে রক্ষা করার প্রাথমিক হাতিয়ার। তাছাড়া মেরুদণ্ডী প্রাণীদের উদ্বর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের চর্মের গঠনও জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে এবং শরীর রক্ষা ছাড়াও এর ওপর বিশেষ বিশেষ দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। ব্যাঙেরা ডাঙায় উঠে বা শীতঘুমের সময় চামড়ার মাধ্যমে শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চালাতে পারে, পাখির চামড়ায় পালক সন্নিবিষ্ট হয়েছে তাদের ওড়ার সুবিধের জন্যে, স্তন্যপায়ীদের চামড়ায় লোম সৃষ্টি হয়েছে তাদের শরীরের অভ্যন্তরীণ তাপ সংরক্ষণের জন্য, অবশ্য পাখির পালকও সে কাজ করে থাকে। তা ছাড়া মাছ, ব্যাঙ ইত্যাদির চামড়া থেকে পিচ্ছিল রস বের হয় যাতে তাদের জলে সাঁতরাতে সুবিধা হয় বা শত্রুর কবল থেকে পিছলে পালাতে পারে, ঠিক যে উদ্দেশ্যে আগেকার দিনে ডাকাতরা পায়ে তেল মেখে ডাকাতি করত। শরীর পিচ্ছিল হওয়ার জন্য এদের শরীরে পোকামাকড় বা জীবাণু বাসা বাঁধতে পারে না। আবার মাছ, ব্যাঙ, কুকুর, বাঘ, সিংহ প্রভৃতির চর্মগ্রন্থি থেকে বিশিষ্ট গন্ধরস বেরিয়ে তাদের চেনার সুবিধা করে দেয়, কাকর বা চর্মগ্রন্থী থেকে বিষাক্ত রস বেরিয়ে তাদের আত্মরক্ষায় সাহায্য করে (যথা ব্যাঙ) কাকর চামড়া থেকে আবার ইলেকট্রিক কারেন্ট বের হয় (ইলেকট্রিক ক্যাট্‌ফিশ্)।

চামড়া দক্ষভাবে যাতে বহিঃপরিবেশের মোকাবিলা করতে পারে প্রকৃতি দেবী তার জন্যে কিছু বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন যথা (১) চামড়ায় আঁশ, পালক, লোম ইত্যাদি আছে আঘাত প্রতিহত করবার জন্য (২) চামড়ার বহিঃস্তর (বাঙলায় যাকে নুনছাল এবং ইংরাজীতে এপিডার্মিস্ বলা হয়) যখনই নষ্ট হয় তখনই বেসাল সেল স্তর এবং ডার্মিস বা অন্তস্তর থেকে তা পরিপূরিত হয়। এই পরিপূরণ প্রক্রিয়া কয়েকটি প্রাণীর ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। যেমন, সাপেদের পুরো বহিঃস্তরটাই মাঝে মাঝে খসে যায়, যাকে বলা হয় "খোলস ছাড়া"। আবার তার জায়গায় নতুন চামড়া গজায়, পেঙ্গুইন বা হর্নবিল পাখির ঋতু বিশেষে সব পালক ঝরে যায়, আবার তা গজায়। (৩) স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে মানুষের চামড়ায় ঘর্মগ্রন্থি থাকে যার থেকে ঘাম বেরিয়ে ধুলোবালি, জীবাণু ইত্যাদি ধুয়ে যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই স্বেদগ্রন্থি কিন্তু সব স্তন্যপায়ীর চামড়ায় থাকে না, যেমন কুকুরের নেই। তাই ঘামের মাধ্যমে তাদের শরীরের লবণ

ডাইভ মেরে শরীরটা ভিজিয়ে নেয়

বেরিয়ে যেতে পারে না যার জন্যে কুকুরের খাদ্যে নুন দেওয়া বারণ। ব্যাঙের চামড়ায় কিন্তু স্বেদগ্রন্থি না থাকলেও জলীয় পদার্থ নিঃসারী গ্রন্থি আছে অথচ সাপের চামড়া একেবারে শুষ্ক তাই বোধ হয় সাপেরা নোংরা চামড়া "বাসাংসী জীর্ণানীর" মত পুরোটাই মধ্যে মধ্যে বদলে নেয়। (৪) চামড়া এবং চুলের স্বাস্থ্যের জন্য এগুলি তৈলাক্ত রাখলে ভাল হয় যার জন্য আধুনিক প্রসাধনে বিভিন্ন কেশ তৈল বা শরীরে মাখার ক্রীম ইত্যাদি ব্যবহার করা হয় এবং সব জাতীয় ক্রীমেরই প্রধান উপাদান ল্যানোলীন, ভেস্‌লিন অথবা প্রপিলিন গ্লাইকল প্রভৃতি তৈলাক্ত পদার্থ। প্রকৃতি দেবীও স্তন্যপায়ীদের লোম বা পাখির পালক যাতে সুন্দর,, কার্যক্ষম এবং জীবাণুমুক্ত থাকে তার জন্য এদের চামড়ায় তৈলগ্রন্থি (সিবেসাস গ্ল্যাণ্ড) দিয়েছেন। লোমশ প্রাণীদের সারা অঙ্গেই এই গ্রন্থিগুলি ছড়িয়ে থাকে কিন্তু পাখিদের কেবলমাত্র পুচ্ছমূলেই এরা সীমাবদ্ধ।

বেশীর ভাগ প্রাণীই চামড়ার মত এমন এক অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব শুধু প্রকৃতির হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারে না। প্রসাধন করে নিজেরাও চামড়ার যত্ন নেয়। মাছিরা আলতোভাবে ডানার ওপর পিছনের পা বুলিয়ে সেখানকার ধুলো ঝেড়ে নেয়। অনেকে আবার শরীর পরিষ্কার রাখতে স্নান করে। পাখিদের স্নান বেশ দর্শনীয় ব্যাপার। হাঁসের মত জলচর পাখিরা "ডাইভ" মেরে সমস্ত শরীরটাই ভিজিয়ে নেয়, তারপর ডাঙায় উঠে ডানা ঝাপটে জল ঝরিয়ে বা চঞ্চু দিয়ে জলকণা সরিয়ে গা শুকিয়ে নেয়। স্থলচর পাখিরা অগভীর জলে চান করতে ভালবাসে। এতে তাদের বুকের দিকটাই ভেজে, তারপর ডানা ঝাপটে এরা পিঠের দিকেও জল ছিটোয়। কাকেদের অবশ্য কোন কিছুতেই পুরো শরীর ভেজে না যার জন্যে অসম্পূর্ণ চানকে বাঙলায় "কাকের স্নান" বলা হয়। মুরগী, ভরতপাখি, চড়ুই ইত্যাদি পাখিরা আবার ধুলোয় চান করতে ভালবাসে।

কুকুর, বাঘ প্রভৃতি নখওয়ালা স্তন্যপায়ীরা অঙ্গ প্রক্ষালনের জন্য যত না হোক আরামের জন্যই স্নান করে বেশী। বিড়ালরা তো জল থেকে শত হস্ত দূরে থাকে, খরগোস জাতীয় প্রাণীরাও স্নান করে না। খুরওয়ালা প্রাণীদের স্নান কিন্তু গায়ের ধুলো ময়লা সাফ করার উদ্দেশ্যে। মোষ বা শূকররা কাদা জলে স্নান করতে ভালবাসে দুটি কারণে, প্রথমত চামড়ায় কাদার প্রলেপ থাকলে মশামাছি ইত্যাদি কীট-পতঙ্গের হাত থেকে তারা নিষ্কৃতি পায় এবং দ্বিতীয়ত মানুষ যেমন রৌদ্রের উত্তাপ থেকে বাঁচবার জন্য গায়ে চন্দন পঙ্কের প্রলেপ লাগিয়ে প্রসাধন করে—এরাও তেমনি চন্দনের অভাবে গায়ে কাদা মেখে থাকে। ঘোড়া, গাধা বা জেব্রারা ধূলায় গড়াগড়ি

আরামের জন্য বাঘেরাও স্নান করে

দিয়ে গাত্র প্রক্ষালন করে। হাতীর জলক্রীড়া কিন্তু আরাম এবং গায়ের ময়লা ধুয়ে ফেলা উভয় উদ্দেশ্য। লক্ষণীয়, বিড়াল প্রভৃতি যে সব স্তন্যপায়ী চান করে না তারা গাছের গুঁড়ি, টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি শক্ত অমসৃণ কোন জিনিসে গা ঘসে অঙ্গ প্রক্ষালনের কাজটা সেরে নেয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বানরবর্গে মানুষ ছাড়া আর কেউ স্নান জিনিসটা পছন্দ করে না।

শুধু গা থেকে ধুলো ময়লা ধুয়ে ফেললেই হল না, মানুষের কেশ বিন্যাসের মত প্রাণীরাও পালক বা লোমের যত্ন করে। পালক জড়িয়ে গেলে পাখিরা ওড়ে কি করে বা লোম জড়িয়ে গেলে স্তন্যপায়ীদের অভ্যন্তরীণ ভারসাম্য বজায় রাখার কি হবে? সুতরাং এগুলির পুনর্বিন্যাসে জন্তুরা বেশ সময় ব্যয় করে। এ প্রসাধনে তাদের অবশ্য দেখতেও সুন্দর লাগে। তাই প্রায়ই দেখা যায় পাখিরা ঠোঁট দিয়ে পালকগুলি বিন্যস্ত করে নিচ্ছে এবং সাথে সাথে পুচ্ছমূলের তৈলগ্রন্থি থেকে তৈল নিয়ে সারা পালক-গুলিতে মাখিয়ে নিচ্ছে। ময়না, টিয়া প্রভৃতি যে সব পাখির শরীরে তৈলগ্রন্থি নেই তাদের পালক থেকে এক রকম পাউডার তৈরি হয়, এরা চঞ্চু দিয়ে সেটা সারা গায়ে মাখিয়ে নেয়।

আগেই বলা হয়েছে বেশীর ভাগ স্তন্যপায়ীর শরীর ঘন লোমে আবৃত। উভচর স্তন্যপায়ীদের (যথা বাদুড়) ডানায় লোম বা পালক থাকে না, স্থলচর স্তন্যপায়ীদের

একজন আর একজনের উকুন বেছে দিচ্ছে

মধ্যে মানুষ এবং কন্দরবাসী স্তন্যপায়ীর শরীরও অপেক্ষাকৃত নির্লোম, তাছাড়া জলচর স্তন্যপায়ীদের (যথা হিপোপটেমাস্ ও তিমি মাছ) চামড়াও লোমবিহীন। লোমশ স্তন্যপায়ীদের শারীরবৃত্তীয় সুবিধার কথা আগেই বলা হয়েছে কিন্তু প্রধান অসুবিধা হল লোমের ফাঁকে ফাঁকে খাবারের টুকরো আটকে পচন ধরতে পারে অথবা উকুন জাতীয় পরজীবী বাসা বাঁধতে পারে। তাই গাত্র কণ্ডুয়ন বা লেহন করে কেশ প্রসাধন এদের মধ্যে বহুল প্রচলিত। মজার কথা কয়েক শ্রেণীর স্তন্যপায়ীর নখে চিরুনীর মত যন্ত্রও দেখা যায়। চতুষ্পদ নখীরা সাধারণত পশ্চাৎ পদ দিয়ে সারা দেহের কেশদাম পরিষ্কার করলেও পদচতুষ্টয় কিন্তু লেহন করেই সাফ করে। বাঘ, সিংহ, বিড়াল প্রভৃতি প্যান্থেরা বা ফেলিসগনীয় নখীদের জীভ খুবই অমসৃণ সুতরাং লেহন করে গা পরিষ্কারে এরা বেশ দক্ষ হয়। খরগোস জাতীয় প্রাণীরা খুব যত্ন করে কান পরিষ্কার করে এবং এদের চামড়ার তৈলগ্রন্থি থেকে যে তেল বের হয় সেটা এদের চামড়ায় রৌদ্রতাপে জালা ধরিয়ে দেয় বলে এরা লেহন করে সে তেলটা সরিয়ে ফেলে। লক্ষণীয়, মানুষ কিন্তু স্নান-বাথের সময় সারা শরীরে ট্যানিং অয়েল লাগিয়ে নেয়। গোরু প্রভৃতি খুরওয়ালা স্তন্যপায়ীরা কেবলমাত্র লেহন করেই গাত্র মার্জন করে এবং শরীরের যে অংশগুলো লেহন করতে পারে না সেগুলি তার জাত ভাইদের দিয়ে পরিষ্কার করিয়ে নেয়। নখীদের লোম পরিষ্কার করার আর এক উপায় কৃন্তক দাঁত দিয়ে উকুন, পোকামাকড় বেছে ফেলা।

যদিও নিম্নশ্রেণীর প্রাণী, বিশেষ করে পাখিদের মধ্যে সময় বিশেষে শরীর কণ্ডুয়ন বিশেষ ভাববহ, বানর বর্গীয় প্রাণীদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই জাতীয় প্রসাধন রীতিমত সামাজিক প্রথায় পর্যবসিত হয়েছে। আবার বানরবর্গের মনুষ্য নামক প্রজাতির ক্ষেত্রে, বিশেষ করে আধুনিক লোকদের কাছে চুল ছাঁটা, দাড়ি কামান, দাঁত মাজা, গাত্র প্রক্ষালন ইত্যাদি প্রসাধনের যে বিশেষ সামাজিক তাৎপর্য আছে তা বলে দিতে হবে না। বানরদের অনেক সময় হাত দুটি মুক্ত রেখে বসে থাকতে দেখা যায় এবং একা একা থাকলে তো বটেই, দলে থাকলে বেশী করে হাত দিয়ে গাত্র কণ্ডুয়ন বা উকুন বাছা এদের একটা বদ অভ্যাসই বলা যায়, অনেকটা মানুষের চুল ছেঁড়া রোগের (টাইকোটিলো ম্যানিয়া) মত। চতুষ্পদী জন্তুদের সঙ্গে বানরের গাত্র কণ্ডুয়নের তফাৎ এই যে এ কাজে এরা পশ্চাৎপদের চেয়ে হাতই ব্যবহার করে বেশী এবং এদের আঙুলগুলির স্পর্শকাতরতা বেশী (Prehensile fingers), তাই এরা লোমের ফাঁকে আটকে থাকা পোকামাকড়, বা খাবারের টুকরো নিখুঁতভাবে সন্ধান করে বেছে ফেলতে পারে। তবে মানুষের মত এরা তো আর আয়নার

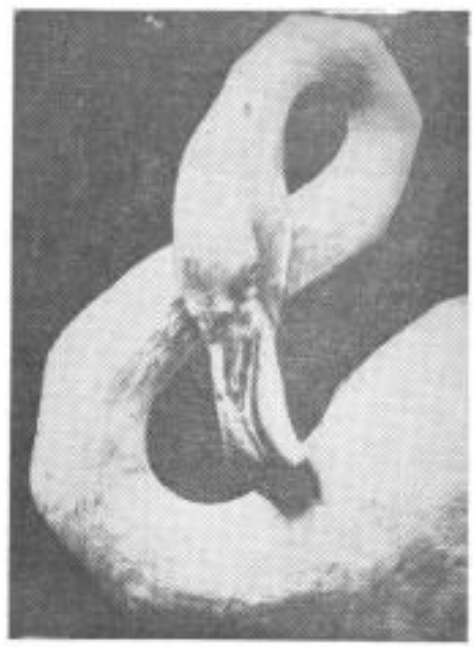

ঠোঁট দিয়ে শরীর পরিষ্কার করছে

ব্যবহার জানে না. তাই শরীরের পশ্চাৎদেশ প্রসাধনের জন্য এরা অপরের সাহায্য নিয়ে থাকে। দুটি বন্ধুভাবাপন্ন বানর পরস্পরের সান্নিধ্যে থাকলে পরস্পরের গা চুলকে, উকুন বেছে প্রসাধন করে দেয়। কালক্রমে গাত্র কণ্ডুয়নটা এদের সমাজে বন্ধুত্বের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুটি অপরিচিত বানর পরস্পরের সম্মুখীন হলে প্রথমেই তাদের মনে প্রতিযোগিতার স্পৃহা জাগে এবং এমতক্ষেত্রে দুর্বল প্রতিপক্ষ হয় পালিয়ে গিয়ে দূর থেকে সবল প্রতিপক্ষের দিকে একটা হাত বাড়িয়ে সন্ধি প্রার্থনা করে অথবা ওষ্ঠদ্বয়ের চুম্বনভঙ্গী করতে থাকে এবং চুচুর্কৃতির ফাঁকে ফাঁকে জিভ বার করে সবল প্রতিপক্ষকে বুঝিয়ে দেয় যে সে তার গাত্র কণ্ডুয়ন করে দিতে ইচ্ছুক, যেন বলতে চায় "বাপুহে, মারামারি কর না, তার চেয়ে এস তোমার গা চুলকে দি!" এবং সবল প্রতিপক্ষ ক্ষমাশীল হলে শরীরের যে অংশ চুলকে নিতে চায় সেটি ক্ষমাপ্রার্থীর দিকে এগিয়ে দেয়। ব্যস, সন্ধি স্থাপন হয়ে গেল। এ নিয়ে একটা মজার গল্পও আছে। বিখ্যাত প্রকৃতিবিদ ডিয়েন ফাস একবার এক গরিলার দ্বারা আক্রান্ত হন। বানর বর্গের এই সামাজিক প্রথাটা ফাসর জানা ছিল তাই তিনি নিজের গা চুলকতে শুরু করলেন, তাতেই গরিলাটি শান্ত হল।

মানুষও বানর বর্গের প্রাণী, সুতরাং তাদের মধ্যেও যে চর্মের পরিচর্যা একটা সামাজিক রূপ নেবে এতে আর আশ্চর্য কী? আমরা কথায় বলি "পরস্পর পিঠ চুলকান সমিতি"। কথাটার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করতে গেলে বানরদের ব্যবহার লক্ষণীয়। প্রসাধনের জন্য মানুষের সমাজে নাপিত, ম্যানিকিউরিস্ট, চিরোপডিস্ট, ম্যাসিউস প্রভৃতি পেশার সৃষ্টি হয়েছে। এখনকার দিনে বিউটি পারলার, হেয়ারড্রেসিং সেলুন তো রাস্তায় রাস্তায়; তাছাড়া সামাজিক স্নানের জন্য সাওয়ানা বাথ, মাত বাথ, সালফার বাথ ইত্যাদি আছে, নিদেন পক্ষে পুকুর বা নদীর ঘাট তো আছেই। সেখানে প্রসাধনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ভাব আদান প্রদানের কাজটাও হয়ে যায়। তবে অন্যান্য বানরের সঙ্গে নরের সামাজিক প্রসাধনের বড় তফাৎ এই যে মানুষ কথা বলে সমাজের আর পাঁচজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতে পারে, সতি সত্যি তাদের কিন্তু পিঠ চুলকে স্তাবকতা করতে হয় না। বাবু যত বলে, পারিষদ যদি তার চেয়ে শতগুণ বলতে পারে তবে মিথ্যে মিথ্যে পিঠ চুলকে ঘা করে আর কী হবে?

বি, এফ ১১৮ সল্ট লেক সিটি, কলি-৫৪

ধাঁধা

সুনীত রায়

আমরা সবাই মিলে পার্কে বসে যখন অরুণদাকে নিয়ে আলোচনা করছি, অমনি মাথার ওপর কে যেন ছোট্ট একটা গাঁট্টা মারল।

শমীক পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখে, যাকে নিয়ে এত আলোচনা, স্বয়ং সেই অরুণদা এসেই হাজির।

আমরা সবাই মিলে বললাম—অরুণদা, তোমার সেই বিখ্যাত ধাঁধার ঝুলির মুখটা একটু খুলবে নাকি? তোমাকে পেলে, আমরা ধাঁধা ছাড়া আর কিছু ভাবতেই পারি না।

তা বেশ, আজ আমি তোমাদের যে ধাঁধাটা বলব, একটু অন্য ধরনের ধাঁধা। তোমরা তো সবাই পাটীগণিতে ঘড়ির অঙ্ক করেছ আর রাস্তাঘাটে যে কতরকমের ঘড়ি প্রতিদিন দেখতে পাও তার তো ইয়ত্তা নেই। তবে আমার ঘড়িটা একটু অন্য ধরনের—বলেই অরুণদা বেঞ্চির উপরে একটা বড় ঘড়ি আঁকল। দেখো শমীক, এই ঘড়িতে অন্য ঘড়ির মতো ১ থেকে ১২ অব্দি সংখ্যা সুন্দরভাবে সাজানো রয়েছে। এর মধ্যে থেকে তুমি যে কোন একটা সংখ্যা চিন্তা কর।

শমীক বলল—ভেবেছি, এরপর কি করতে হবে বল।

চুপিচুপি তোমাদের বলে রাখি শমীক যে সংখ্যাটা ঘড়ির মধ্যে ভেবেছিল সেটা হল ৬। কারণ আসল ঘড়িতে তখন ঠিক ৬টাই বাজছিল।

অরুণদা বলল—এবার আমি ঘড়ির উপর লাঠি দিয়ে টোকা মারছি, আর প্রত্যেক টোকার আওয়াজ শোনার সঙ্গে সঙ্গে তুমি যে সংখ্যাটা ভেবেছ, তারপর থেকে (১, ২, ৩,.....করে) গুণে যাবে।

শমীকও কথামতো ৬ এর পর থেকে মনে মনে ৭, ৮, ৯, করে গুণতে শুরু করল। হঠাৎ, অরুণদা লাঠি দিয়ে আওয়াজ করতে করতে বলল, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি, তুমি যেই ২০ গুণবে, তখনই থেমে গিয়ে আমায় বলবে। শমীক ঠিকমতো গুণতে গুণতে ঠিক যে আওয়াজে ২০ গোনা হল তখনই অরুণদাকে বলতে—অরুণদা বিজ্ঞসুলভ চালে ঘড়ির উপর ঠিক সেই বিশেষ সংখ্যা ৬-এর উপরেই লাঠি দিয়ে বসে আছে, কারণ শমীকের মনে করা সংখ্যাটা ছিল ৬। রঞ্জন, ইন্দ্র, শমীক, সবাই মিলে অরুণদাকে জিজ্ঞেস করে বসল, কি করে এমন হল? তোমরাও ভাব।

বিজ্ঞানের ভেলকি

যাদুসম্রাট এ. সি. সরকার

বিজ্ঞানের দৌলতে কি এই পৃথিবী জুড়ে কম আজব ঘটনা ঘটছে? বিজ্ঞানের এক একটি অবিষ্কারই তো এক একটা পরম বিস্ময়ের বস্তু। এইসব বিস্ময় যে বিজ্ঞানের সৃষ্টি সে-কথা আমরা জানি বলেই এগুলোকে আমরা ম্যাজিক বা যাদুবিদ্যার কাণ্ডকারখানা বলে মনে করি না। তা না হলে সিনেমার পর্দার থুকে পরলোকগত উত্তমকুমারের হাঁটা-চলা, কথা বলা, দৌড়ানো, গান করা কি ম্যাজিকের চেয়ে কম চমকপ্রদ বা কম বিস্ময়কর ব্যাপার হত?

সত্যি কথা বলতে কি, আমরা যাদুকরেরা কার্যসিদ্ধির জন্য অনেক সময়ে হাত পাতি বিজ্ঞানের কাছে। বিজ্ঞানের অবদানকে কাজে খাটিয়ে কখনো কখনো এমন অদ্ভুত সব যাদু-বিস্ময় আমরা সৃষ্টি করি যা বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারেন না মহা বুদ্ধিমান দর্শকেরাও। যাদুশক্তির অসামান্য মহিমার নিদর্শন বলেই তাঁরা মেনে নেন এগুলোকে। আসল বিজ্ঞানের প্রয়োগ পদ্ধতি থাকে আড়াল করা, তাই তো মহা ধুরন্ধর বিজ্ঞানীরা পর্যন্ত এগুলোকে বিজ্ঞানের মহিমা বলে ধরতে পারেন না আর যাদুকরের কীর্তি দেখে অবাক হয়ে হাততালি দেন।

এমনি ধারা কতকগুলি বিজ্ঞান নির্ভর যাদুকৌশলের কথা নিয়ে যদি আলোচনা করি তবে কেমন হয়? যাদুর চমক দেখিয়ে বাবুদের অবাক করার সঙ্গে সঙ্গে প্রকারান্তরে হাতেকলমে বিজ্ঞান চর্চার ব্যাপারটা কি মন্দ লাগবে? এসো তবে কাজে লেগে যাওয়া যাক।

প্রথমে যে মজাদার বিজ্ঞানভিত্তিক যাদু-খেলাটা করতে যাচ্ছি তার জন্য কতকগুলো সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করে নিতে হবে আগে ভাগে। একটা চওড়া বড় মুখ-ওয়ালা জারজাতীয় কাচের পাত্র, একটা কাচের গ্লাস, এক টুকরো ভাল বর্ণবিহীন সেলোফেন কাগজ, কয়েকটা রবার ব্যাণ্ড, একটুখানি লাল কালি আর খানিকটা শক্ত সুতো।

প্রথমে বড় পাত্রটার প্রায় গলা অবধি জলে ভরে নিয়ে তাতে লাল কালি গুলে জলটাকে লালচে করে নাও। এবারে গ্লাসটাকে জলে ভর্তি করে সেলোফেন কাগজের কালিটা তার মুখে আচ্ছা করে আটকে দাও রবার ব্যাণ্ড দিয়ে।

দেখবে, গ্লাস উল্টে ধরলে যেন বেরিয়ে না আসতে পারে গ্লাস থেকে।

এমন করা হয়ে যাবার পর সুতোর ফাঁসের সাহায্যে এই গ্লাসটাকে বড় পাত্রের উপরে এমনভাবে ঝুলিয়ে দেবে যেন বড় পাত্রের জলের মধ্যে গ্লাসটা উল্টো হয়ে ঝুলে থাকে। ছবি দেখে বুঝে নাও সঠিক অবস্থান। সাবধান, সেলোফেন মোড়া গ্লাসের মুখটা কিন্তু বড় পাত্রের তলায় ঠেকলে চলবে না।

এমনি ধারা ঘণ্টা ছয়েক ঝুলিয়ে রাখার পরে, কোন আজব যাদুর গুণে বড় পাত্রের রাঙা জল গ্লাসের মধ্যে ঢুকে গ্লাসের জলে রঙের ছোঁয়া লাগিয়েছে! কেমন মজা বলতো।

সবাই জানো, শিকড়ের ভেতর দিয়ে গাছ মাটি থেকে রস শুষে নিয়ে বেঁচে থাকে। যে বিশেষ পদ্ধতি বা প্রক্রিয়ায় গাছ শিকড় দিয়ে রস শোষণ করে ঠিক সেই একই ভাবে গ্লাস শুষে নিয়েছে রাঙা জল। সেলোফেন কাগজের সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম ফুটোর ভেতর দিয়ে রাঙানো জল ঢুকেছে ঠিক যেমন করে মাটির ভেতরকার জলীয় রস অনায়াসে গাছের ভেতরে প্রবেশ করে শিকরের ভেতরকার অসংখ্য সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম ফুটোর ভেতর দিয়ে। এই বিশেষ পদ্ধতির মূলে OSMOTIC PRESSURE নামক বৈজ্ঞানিক সত্য।

এই মজাদার বিজ্ঞান-ভিত্তিক ম্যাজিকটা করে দেখ, খুব মজা পাবে।

ম্যাজিক সম্বন্ধে কিছু জানতে হলে আমার সঙ্গে রিপ্লাই কার্ডে পত্রালাপ করতে পারো নীচের ঠিকানায়।

"ম্যাজিক ভিলা" ১২।৬, সেলিমপুর রোড,
কলিকাতা—৭০০০৩১

বিদ্যুৎ-শক্তির শৈশব

গঙ্গেশ বিশ্বাস

পৃথিবীতে যে-সব ভৌতশক্তি, অর্থাৎ তাপ, আলোক, শব্দ প্রভৃতি মানুষ ব্যবহার করে, তার মধ্যে বিদ্যুৎ-শক্তির ব্যবহারই সম্ভবতঃ সব থেকে বেশি। একদিকে ছোট-বড় কলকারখানা, ইলেকট্রিক ট্রেন, ট্রামগাড়ী, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, বেতারযন্ত্র, সিনেমা প্রভৃতি চলছে বিদ্যুৎ-শক্তির প্রয়োগে, অপরদিকে আলো, পাখা, হিটার, ইলেকট্রিক-ইস্ত্রি, বৈদ্যুতিক-ঘণ্টা প্রভৃতির মতো অসংখ্য বিদ্যুৎ-চালিত জিনিসপত্র মানুষের দৈনন্দিন জীবনের নানা ধরনের প্রয়োজন মেটাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে আজকের দিনে পৃথিবীতে খুব কম মানুষই আছে, যাদের বিদ্যুৎ-শক্তির কোন ব্যবহারই নজরে পড়ে নি।

বাস্তব কাজের উপযোগী বিদ্যুৎ-শক্তি প্রধানতঃ দুটি উপায়ে পাওয়া যায়—তড়িৎকোষের সাহায্যে এবং তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশ-এর পদ্ধতি থেকে। পৃথিবীতে সব থেকে বেশি বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন হয় এই শেষের আবেশ-পদ্ধতিতে। এই পদ্ধতির জনক মাইকেল ফ্যারাডে[1]।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমের দিকে অ্যারাগো,[2] ওরস্টেড,[3] অ্যামিজয়ার[4] প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণের তড়িৎ-প্রবাহ-সংশ্লিষ্ট চৌম্বক-ক্ষেত্রের গবেষণার ফলাফল লক্ষ্য করে ফ্যারাডে তর্ক তোলেন, যদি কোন পরিবাহীর মধ্য দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ পাঠালে তার নিকটবর্তী আবর্তনক্ষম চুম্বকের বিক্ষেপ হতে পারে, তবে কোন চৌম্বকক্ষেত্রে একটি চলনক্ষম (movable) প্রবাহধারী পরিবাহী স্থাপন করলে, সেই পরিবাহীই বা বিচলিত হবে না কেন?—তিনি পরীক্ষাদ্বারা তড়িৎপ্রবাহের চতুর্দিকে চুম্বকের ঘূর্ণন এবং এর বিপরীত চৌম্বকক্ষেত্রে অবস্থিত তড়িৎপ্রবাহযুক্ত-পরিবাহীর আবর্তন প্রদর্শন করেন। আধুনিক সমপ্রবাহ-মোটরের নীতি তাঁরই আবিষ্কার (1821 খৃঃ-অব্দে)।

ফ্যারাডের তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশ-সংক্রান্ত পরীক্ষা :

ফ্যারাডের মনে আরো প্রশ্ন জাগে, যদি তড়িৎপ্রবাহ কোন পরিবাহীর চারপাশে চৌম্বকক্ষেত্র সৃষ্টি করতে পারে, তবে কোন পরিবাহীতে চৌম্বকক্ষেত্র প্রয়োগ করলেই বা সেই-পরিবাহীতে তড়িৎপ্রবাহ উৎপন্ন হবে না কেন?—এই যুক্তির ওপর নির্ভর করে অগ্রসর হতে-হতে 1831 খৃস্টাব্দে তিনি সত্যই কতকগুলি অসাধারণ আবিষ্কারের গৌরব অর্জন করেন।

(ক) দণ্ডচুম্বকের সাহায্যে পরীক্ষা :

তিনি লক্ষ্য করলেন, যখন একটি তারের বদ্ধকুণ্ডলীর মধ্যে, অর্থাৎ তারের দুটি প্রান্ত যুক্ত অবস্থার কুণ্ডলীর মধ্যে, একটি দণ্ডচুম্বকের কোন মেরু প্রবেশ করানো যায়, তখন ঐ কুণ্ডলীর তারের মধ্যে একটি ক্ষণস্থায়ী তড়িৎপ্রবাহ চলতে থাকে। কুণ্ডলীর তারের তড়িৎ ততক্ষণই প্রবাহিত হয়, যতক্ষণ চুম্বকটি কুণ্ডলীর মধ্যে গতিশীল থাকে। আবার চুম্বকটি যখন কুণ্ডলীর বাইরে নিয়ে আসা হয়, তখনো প্রবাহ হয় প্রথমবারের প্রবাহের বিপরীত-মুখী। বলা প্রয়োজন, বদ্ধকুণ্ডলীতে তড়িৎপ্রবাহ একটি গ্যালভানোমিটার নামক প্রবাহনির্দেশক যন্ত্রের সাহায্যে লক্ষ্য করা যায়।

(খ) মুখ্য ও গৌণকুণ্ডলীর পরীক্ষা :

ফ্যারাডে আরো লক্ষ্য করেন, চুম্বকের পরিবর্তে একটি বেশি-ব্যাসের বদ্ধকুণ্ডলী এবং আর একটি অপেক্ষাকৃত কম-ব্যাসের কুণ্ডলীর সাহায্যেও বদ্ধকুণ্ডলীতে আগের মতোই তড়িৎপ্রবাহ উৎপন্ন করা সম্ভব। তবে কম-ব্যাসের কুণ্ডলীতে একটি স্থায়ী তড়িৎপ্রবাহ (সমপ্রবাহ) চালু রাখা প্রয়োজন। আমরা কম-ব্যাসের কুণ্ডলীকে বলতে পারি মুখ্যকুণ্ডলী, আর বেশি-ব্যাসের কুণ্ডলীকে গৌণকুণ্ডলী (চিত্র নং—২)।

একটি স্থায়ী প্রবাহযুক্ত মুখ্যকুণ্ডলীর কোন প্রান্তকে গৌণকুণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করালে, কিম্বা তা থেকে বের করে আনলে, গৌণকুণ্ডলীতে প্রতিবারেই একটি ক্ষণস্থায়ী তড়িৎপ্রবাহ প্রকাশ পায়। এ-ক্ষেত্রেও প্রথম বারের তড়িৎপ্রবাহ দ্বিতীয় বারের তড়িৎপ্রবাহের বিপরীতমুখী হয়।

অথবা, মুখ্যকুণ্ডলীকে গৌণকুণ্ডলীর মধ্যে স্থায়ীভাবে স্থাপন ক'রে, মুখ্যকুণ্ডলীতে কোন ব্যাটারি থেকে হঠাৎ প্রবাহ পাঠানো যায়, কিম্বা মুখ্যকুণ্ডলীর প্রবাহ হঠাৎ বন্ধ করা যায়, তবে এই দুটি পরীক্ষাতেই আগের মতোই গৌণকুণ্ডলীতে দুই-বিপরীতমুখী প্রবাহ চলতে থাকে।

আবার, মুখ্যকুণ্ডলী গৌণকুণ্ডলীর মধ্যে স্থির থাকা কালে যদি মুখ্যকুণ্ডলীর তড়িৎপ্রবাহ হঠাৎ বাড়ানো বা কমানো যায়, তবে এবারও গৌণকুণ্ডলীতে দুই পরীক্ষাতেই দুই বিপরীতমুখী প্রবাহ প্রকাশ পায়।

এইসব পরীক্ষাকালে আর একটি বিশেষ ঘটনা লক্ষ্য করা যায়—দণ্ডচুম্বক বা মুখ্যকুণ্ডলীর কোন প্রান্তকে দ্রুত

গৌণকুণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করালে, বা বের করে আনলে, গৌণকুণ্ডলীতে উৎপন্ন তড়িৎপ্রবাহের পরিমাণ হয় বেশি। অর্থাৎ, বদ্ধকুণ্ডলীতে ক্ষণস্থায়ী প্রবাহ বা সংশ্লিষ্ট তড়িচ্চালক-বলের পরিমাণ নির্ভর করছে গৌণকুণ্ডলীর মধ্যে চুম্বক বা মুখ্যকুণ্ডলীর গতি-পরিবর্তনের হারের ওপর।

এইভাবে চুম্বক অথবা প্রবাহধারী মুখ্যকুণ্ডলীর সাহায্যে কোন বদ্ধবর্তনীতে তড়িৎপ্রবাহ উৎপন্ন করার ঘটনাকে বলে 'তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশ' (electro-magnetic induction)। উৎপন্ন তড়িৎপ্রবাহকে বলে আবিষ্ট-তড়িৎপ্রবাহ (induced current)।—এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, তড়িৎ একপ্রকার শক্তি। শক্তি কখনো সৃষ্টি করা যায় না, কেবল একপ্রকার শক্তিকে আর এক প্রকার শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায় মাত্র। বিশ্লেষণ করে দেখলে বোঝা যায়, প্রত্যেক ক্ষেত্রে গৌণকুণ্ডলীতে আবিষ্ট-তড়িৎ-প্রবাহ প্রকাশ পায় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন চৌম্বকক্ষেত্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াজনিত যান্ত্রিকশক্তির রূপান্তরের ফলে।

আপাতদৃষ্টিতে তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশের পরীক্ষাগুলি অতি সাধারণ এবং ম্যাজিকগোছের ব্যাপার বলে মনে হলেও, এইসব পরীক্ষার ফলাফলের মধ্যে যে কী গভীর তাৎপর্য এবং বিরাট সম্ভাবনা লুকানো ছিল, তা সেই আমলের সাধারণ-মানুষ তো দূরের কথা, স্বয়ং ফ্যারাডেও হয়ত উপলব্ধি করতে পারেন নি।—এই-প্রসঙ্গে অনুরূপ এক আবিষ্কারের কথা উল্লেখ করা যায়ঃ অষ্টাদশ-শতাব্দীতে আকাশে নানারকমের বেলুন ওড়ানোর পরীক্ষা চলছিল। অবশেষে 1783 খৃস্টাব্দের 29শে অগাস্ট ফ্রান্স-এ মঁসিয়ে চার্লস তিনলক্ষ দর্শকের সম্মুখে সর্বপ্রথম বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে একটি হাইড্রোজেন ভর্তি বেলুন ওড়ালেন। সেই সময়ে আমেরিকার বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এবং রাজনীতিবিদ্ বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিনও উপস্থিত ছিলেন মাঠে। বেলুন ওড়ানোর দৃশ্য দেখে, জনৈক দর্শক ফ্রাংকলিনকে প্রশ্ন করেন, "আচ্ছা, এর মধ্যে হিতকর কি আছে?"—উত্তরে ফ্রাংকলিনও পাল্টা প্রশ্ন রাখেন, "আচ্ছা, একটি নবজাত শিশুর মধ্যে হিতকর কি থাকে?"—আজ দেখতে পাই, মাত্র 150 কি 200

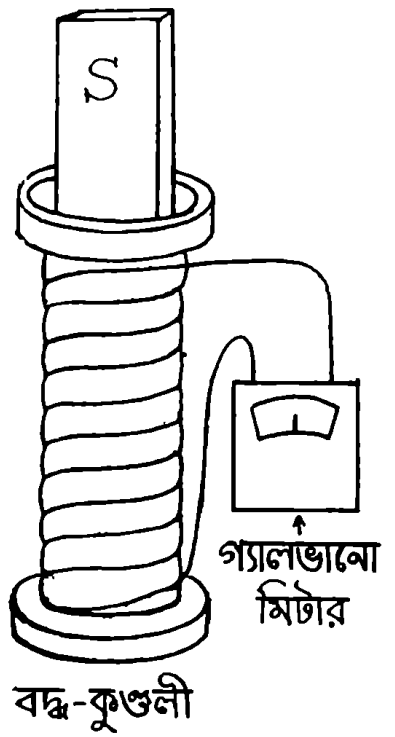

চিত্র নং 1- দণ্ড চুম্বকের সাহায্যে পরীক্ষা

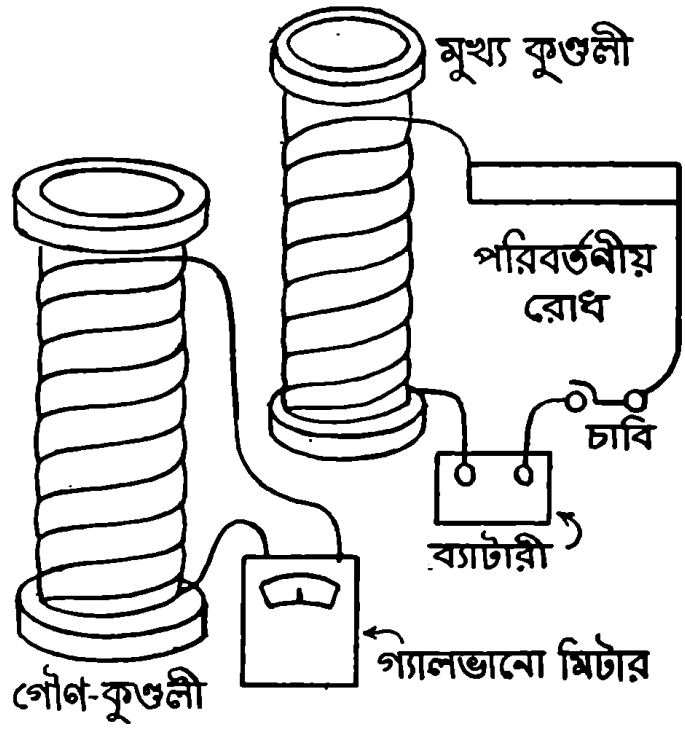

চিত্র নং 2 - মুখ্য ও গৌণ কুণ্ডলীর পরীক্ষার সাজেসরঞ্জাম

বছরের মধ্যে চার্লস এবং ফ্যারাডের এককালের নবজাত আবিষ্কার বর্তমান যুগে বিমান এবং বিদ্যুতের ক্ষেত্রে কি বিরাট বিবর্তনই না ঘটিয়েছে।

[1]Faraday Michael : জন্ম—1791-এর 22শে সেপ্টেম্বর লণ্ডনের উপকণ্ঠে নিউইঙ্গটনে, মৃত্যু—1867-এর 25শে অগাস্ট লণ্ডনের হ্যাম্পটনকোর্টে।

পিতা ছিলেন কর্মকার। 14 বছর বয়সে তাঁকে শিক্ষানবিস রাখা হয় এক পুস্তক বিক্রয় ও বাঁধাইয়ের প্রতিষ্ঠানে। যে-সব বই তাঁর হাতে আসত, সেগুলি তিনি মন দিয়ে পড়তেন। বিজ্ঞান-বিষয়ে ছিল তাঁর বেশি আগ্রহ। বিজ্ঞানে তাঁর অনুরাগ দেখে এক সহৃদয় ব্যক্তি রয়্যাল ইনস্টিটিউশনে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী সার হামফ্রি ডেভির বক্তৃতা শোনার জন্য তাঁকে পাশ যোগাড় করে দেন। ফ্যারাডে বিশেষ নিষ্ঠার সঙ্গে ডেভির বক্তৃতা শুনতেন এবং নোট নিতেন। ডেভির পরীক্ষাগারে কাজ করার সুযোগ লাভের উদ্দেশ্যে, একসময় ফ্যারাডে ডেভির বক্তৃতার নোটসহ ডেভির নিকট চাকরীর আবেদন জানান। 21 বছর বয়সে ফ্যারাডে ডেভির নিকট ল্যাবরেটরী-অ্যাসিস্ট্যাণ্টের চাকরী পান। ডেভির পরীক্ষাগারে কাজ করে ফ্যারাডে পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন-শাস্ত্র সংক্রান্ত বহু আবিষ্কারের গৌরব অর্জন করেন। তাঁর আবিষ্কার সমূহের মধ্যে বৈদ্যুতিক-মোটর, তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশ, চৌম্বকক্ষেত্রে আলোকের সমবর্তন, তড়িৎ-বিশ্লেষণের সূত্রাবলী, ক্লোরিন-গ্যাস প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সব থেকে বড় কথা, তাঁর আনুষ্ঠানিক লেখাপড়া বেশি কিছু না হলেও, বিজ্ঞানে অবদানের দিক থেকে তাঁর তুল্য প্রতিভাধর বিরল।

[2]Arago, Francois Jean Dominique (1786-1853)—ফরাসী জ্যোতির্বিদ্ এবং প্রাকৃতিক-দার্শনিক; তড়িৎ ও চৌম্বক-বিষয়ে এবং আলোর সমবর্তনের ওপর গবেষণার জন্য খ্যাত।

[3]Oersted, Hans Christian (1777-1851)—দিনেমার দার্শনিক; তড়িৎপ্রবাহ-সংশ্লিষ্ট চৌম্বকক্ষেত্রের ওপর গবেষণার জন্য বিশেষভাবে খ্যাত। তাঁর তড়িৎ-সংক্রান্ত গবেষণা টেলিগ্রাফ আবিষ্কারের সহায়ক হয়েছে।

[4]Ampere, Andre Marie (1775-1836)—প্রখ্যাত ফরাসী গণিতবিদ্, কিন্তু তড়িৎ ও চুম্বকত্ব বিষয়েও রয়েছে তাঁর প্রভূত অবদান।

ঋষি বঙ্কিম সরণী পোঃ—কাঁথি, জেলা—মেদিনীপুর
পিন—৭২১৪০১

শব্দকূট

গুরুপদ ঘোষ

নীচের সঙ্কেত অনুযায়ী শব্দকূটটি সমাধান কর ঃ—

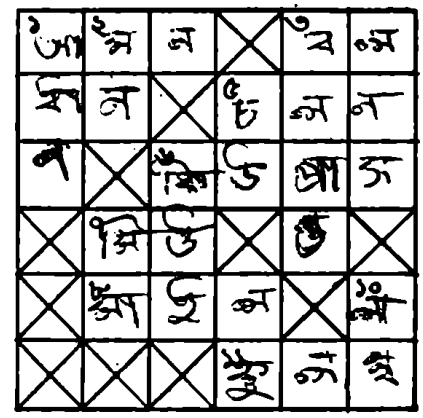

পাশাপাশি

১। ধানের একটি প্রজাতি।
৩। যার প্রয়োগে বস্তুর স্থানচ্যুতি ঘটে।
৪। ভারতে উৎপন্ন প্রধান শস্য।
৫। প্রাণিজগতের একটি বৈশিষ্ট্য।
৬। তামার একটি অক্সিজেন যৌগ।
৭। একটি গ্রীক অক্ষর, যা বিজ্ঞানের গাণিতিক হিসাবে প্রায়ই ব্যবহৃত হয়।
৮। দূরত্ব মাপার একক।
১১। তড়িৎ আধানের ব্যবহারিক একক।

উপর থেকে নিচে ঃ—

১। দু'টি বস্তু ঘর্ষণের ফলে উৎপন্ন হয়ে থাকে।
২। যা মানুষ নিমেষের মধ্যে যে কোন জায়গায় নিয়ে যেতে পারে।
৩। বিভিন্ন আকারের চুম্বকের মধ্যে একটি।
৬। যে পাখির পাখা নেই।
৯। একটি টক জাতীয় ফল উল্টোভাবে লিখলেযা হয়।
১০। দুটি সরলরেখা পরস্পর সমকোণে থাকলে একটি অপরটির উপর যা হয়।

সমাধান—

পাশাপাশি—

১। আমন ৩। বল ৪। ধান ৫। চলন ৬। কিউপ্রাস ৭। মিউ ৮। মাইল ১১। কুলম্ব

উপর থেকে নিচে—

১। আধান ২। মন ৩। বলপ্রান্ত ৬। কিউই ৯। লকু (কুল) ১০। লম্ব

রসায়নের সহজপাঠ (৩)

অমরনাথ রায়

আমরা জানি, **যে পদার্থকে বিশ্লেষণ করলে দুই বা তার বেশী মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায় কিংবা দুই বা তার বেশী মৌলিক পদার্থ নির্দিষ্ট ওজনে পরস্পর রাসায়নিক বিক্রিয়া দ্বারা যুক্ত হ'য়ে যে নতুন ধর্মবিশিষ্ট পদার্থ উৎপন্ন করে, তাকেই যৌগিক পদার্থ বলে।**

যৌগের এই সংজ্ঞা অনুযায়ী জল, নানারকম লবণ, অ্যাসিড, ক্ষার ইত্যাদি—সবই যৌগিক পদার্থ। জলকে তড়িৎ প্রবাহ দ্বারা বিশ্লিষ্ট করলে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন নামক মৌল দু'টি পাওয়া যায়। নির্দিষ্ট ওজনের সোডিয়ামের সঙ্গে নির্দিষ্ট ওজনের ক্লোরিন যুক্ত হয়ে সোডিয়াম ক্লোরাইড নামক লবণ উৎপন্ন করে। এই লবণে, সোডিয়াম বা ক্লোরিনের কোন গুণ বর্তমান থাকে না, তাই 'সোডিয়াম ক্লোরাইড' একটি যৌগ। যৌগিক পদার্থের অণু একাধিক বিভিন্ন ধরনের মৌলের পরমাণু দিয়ে গড়া। যেমন, কার্বন ডাই-অক্সাইড একটি যৌগ। এর একটি অণু, একটি কার্বন পরমাণু ও দু'টি অক্সিজেন পরমাণু দিয়ে গড়া। **যৌগিক পদার্থ সর্বদাই সমসত্ত্ব হয় অর্থাৎ যৌগের প্রতি অংশের ধর্ম ও গঠন একই রকম হয়।**

দু'টি মৌলিক পদার্থের সরাসরি রাসায়নিক সংযোগে উৎপন্ন যৌগকে বাইনারি কম্পাউন্ড বা দ্বি-মৌল যৌগ বলে। এই ধরনের যৌগের নামের শেষের দিকে আইড (ide) **শব্দটি যুক্ত থাকে।** যেমন, ক্যালসিয়াম কার্বাইড (CaC_2) যৌগটি ক্যালসিয়াম ও কার্বনের সরাসরি রাসায়নিক সংযোগে উৎপন্ন হয় বলে এটি একটি দ্বি-মৌল যৌগ। অনুরূপভাবে H_2S (হাইড্রোজেন সালফাইড), CaO (ক্যালসিয়াম অক্সাইড), NH_3 (অ্যামোনিয়া) ইত্যাদি বাইনারি কম্পাউণ্ড বা দ্বি-মৌল যৌগ।

যৌগের বৈশিষ্ট্য ঃ

(i) যৌগিক পদার্থে উপাদানগুলি সর্বদাই একটি নির্দিষ্ট ওজনের অনুপাতে পরস্পর সংযুক্ত থাকে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে আয়রন ও সালফারের সংযোগে গড়া যৌগ 'আয়রন সালফাইডে' (FeS) 7 ভাগ ওজনের আয়রন ও 4 ভাগ ওজনের সালফার থাকবেই। এই ওজনের কোন ব্যতিক্রম হয় না।

(ii) যৌগিক পদার্থে উপাদানগুলির আপন আপন ধর্ম সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হ'য়ে গিয়ে সম্পূর্ণ নতুন ধর্মবিশিষ্ট পদার্থের সৃষ্টি হয়। আয়রন ও সালফারের সংযোগে গড়া যৌগ 'আয়রন-সালফাইড' (FeS) যৌগটিকে চুম্বক আকর্ষণ করে না। এই যৌগের কোন অংশই কার্বন ডাই সালফাইডে দ্রবীভূত হয় না। যৌগটিতে লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড মেশালে পচা ডিমের গন্ধযুক্ত বর্ণহীন গ্যাস 'হাইড্রোজেন সালফাইড' (H_2S) উৎপন্ন হয়।—এই সব থেকেই প্রমাণিত হয় যে, আয়রন সালফাইড যৌগে আয়রন ও সালফার—কোনটিরই নিজস্ব ধর্ম বজায় থাকে না। এই যৌগটির ধর্ম, তার উপাদান-গুলির ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

(iii) যৌগিক পদার্থের উপাদানগুলিকে সহজ ও স্থূল উপায়ে আলাদা করা যায় না। আয়রন সালফাইডের আয়রন কিংবা সালফারকে এই রকম কোন সহজ পদ্ধতিতে (যথা চুম্বক দ্বারা আকর্ষণ কিংবা কার্বন ডাই সালফাইডে দ্রবীভূত ক'রে পরিস্রাবণ) পরস্পর থেকে পৃথক করা যায় না।

(iv) যৌগিক পদার্থ গঠনের সময় তাপের উদ্ভব বা তাপ শোষণ হবেই। আয়রন সালফাইড যৌগ গঠনের সময় প্রচুর তাপের উদ্ভব হয়।

(v) যৌগিক পদার্থ সব সময় সমসত্ত্ব হয়। আয়রন সালফাইড যৌগের বিভিন্ন অংশের গঠন ও ধর্ম সব সময় একই হয় বলে এই যৌগটি সমসত্ত্ব।

(vi) যে কোন যৌগেরই নির্দিষ্ট গলনাংক ও স্ফুটনাংক থাকে। আয়রন সালফাইড যৌগেরও তাই আছে।

যোজ্যতার ধারণা ঃ

তাহ'লে দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন মৌলের পরমাণুগুলি নির্দিষ্ট সংখ্যার অনুপাতে পরস্পর সংযুক্ত হ'য়ে নির্দিষ্ট যৌগের অণু গঠন করে। সব মৌলের সংযোগ ক্ষমতা কিন্তু এক নয় অর্থাৎ সমান নয়; কারও কম, কারও বা বেশী। কোন মৌলের একটি পরমাণু অন্য কোন মৌলের যত সংখ্যক পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হয়, সেই সংখ্যাকে সাধারণভাবে যোজ্যতা বলা হয়।

দু'টি মৌলের পরমাণু যখন পরস্পর যুক্ত হ'য়ে একটি যৌগ গঠন করে তখন ঐ যৌগে মৌল দু'টির পরমাণুগুলির সংখ্যার অনুপাত নির্দিষ্ট থাকে, এ কথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু এই যৌগের অন্তর্গত একটি মৌলের পরমাণু অন্য আর একটি মৌলের পরমাণুর

সঙ্গে ঠিক একই সংখ্যায় যুক্ত হতে পারে না। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, একটি ক্যালসিয়াম পরমাণু (Ca) 2টি ক্লোরিন (Cl) পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ($CaCl_2$) যৌগের একটি অণু গঠন করে। এই ক্যালসিয়াম পরমাণু (Ca) আবার একটি অক্সিজেন পরমাণুর (O) সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে ক্যালসিয়াম অক্সাইড (CaO) যৌগের একটি অণু গঠন করে। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, Ca-এর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ব্যাপারে Cl-এর চেয়ে অক্সিজেনের (O) ক্ষমতা দ্বিগুণ বেশী। এর কারণ, একটি অক্সিজেন পরমাণু (O) দু'টি ক্লোরিন পরমাণুর (2Cl) কাজ করে। আবার একটি কার্বন পরমাণু (C) দু'টি অক্সিজেন পরমাণুর (2O) সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে একটি কার্বন ডাই-অক্সাইড অণু (CO_2) গঠন করে।—এখানে Ca পরমাণুর চেয়ে কার্বন পরমাণুর (C) যোজন ক্ষমতা দ্বিগুণ। কাজেই বলা যায় যে, পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ক্ষমতা এক এক মৌলের এক এক রকম। **আর মৌলের পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার এই ক্ষমতার নামই যোজ্যতা।**

রসায়ন বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন যে একমাত্র হাইড্রাজোরিক অ্যাসিড (N_3H) ছাড়া হাইড্রোজেনের এমন কোন যৌগ নেই, যার মধ্যে হাইড্রোজেনের একটি পরমাণুর সঙ্গে অন্য কোন মৌলের একাধিক পরমাণু যুক্ত হয়। এর থেকেই বোঝা যায় যে—হাইড্রোজেন পরমাণুর যুক্ত হওয়ার ক্ষমতা সবচেয়ে কম। সেই কারণে হাইড্রোজেনের যুক্ত হওয়ার ক্ষমতাকে প্রমাণ বা স্ট্যাণ্ডার্ড যোজ্যতা ধরা হয়। অতএব যোজ্যতার সংজ্ঞা এইভাবে নির্ধারণ করা যায়ঃ

("কোন মৌলের একটি পরমাণু যত সংখ্যক হাইড্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে রাসায়নিকভাবে যুক্ত হয় কিংবা কোনও হাইড্রোজেন ঘটিত যৌগ থেকে যত সংখ্যক হাইড্রোজেন পরমাণু প্রতিস্থাপিত করে, সেই সংখ্যাটিই হলো ঐ মৌলের যোজ্যতা।")

যোজ্যতার পরিমাপ ঃ

আমরা তিন রকম স্কেলে যোজ্যতার পরিমাপ করতে পারি। (i) হাইড্রোজেন স্কেল (ii) ক্লোরিন স্কেল এবং (iii) অক্সিজেন স্কেল।

যোজ্যতা পরিমাপের হাইড্রোজেন স্কেল ঃ

হাইড্রোজেন কিংবা হাইড্রোজেনের মত অন্য কোন একযোজী মৌলের যত সংখ্যক পরমাণু অন্য কোন মৌলের একটি পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হয় বা কোন মৌলের একটি পরমাণু কোন যৌগ থেকে যত সংখ্যক হাইড্রোজেন পরমাণুকে অপসারিত করে, সেই সংখ্যাই হলো ঐ মৌলের যোজ্যতা। অর্থাৎ মৌলের

$$\text{যোজ্যতা} = \frac{\text{মৌলটির সঙ্গে যুক্ত হাইড্রোজেন পরমাণুর সংখ্যা।}}{\text{যৌগটির মধ্যে মৌলের পরমাণুর সংখ্যা।}}$$

এই নিয়ম অনুসরণ ক'রে কয়েকটি মৌলের যোজ্যতা নির্ণয় করার উদাহরণ নীচে দেওয়া হলো।

যৌগের সংকেত	যুক্ত H পরমাণুর সংখ্যা	মৌলের যোজ্যতা
HBr	1	ব্রোমিনের যোজ্যতা $= \frac{1}{1} = 1$
H_2O	2	অক্সিজেনের যোজ্যতা $= \frac{2}{1} = 2$
NH_3	3	নাইট্রোজেনের যোজ্যতা $= \frac{3}{1} = 3$
CH_4	4	কার্বনের যোজ্যতা $= \frac{4}{1} = 4$

এতক্ষণ তো যুক্ত হাইড্রোজেন পরমাণুর সংখ্যা দ্বারা যোজ্যতা নির্ণয়ের পদ্ধতির কথা বলা হলো। এবারে বলি—প্রতিস্থাপিত হাইড্রোজেন পরমাণুর সংখ্যার দ্বারা যোজ্যতা নির্ণয়ের পদ্ধতির কথা।

$Na + HCl \rightarrow NaCl + H\uparrow$

উপরোক্ত সমীকরণটিতে দেখা যায় যে একটি সোডিয়াম পরমাণু HCl-এর একটি অণু থেকে এক পরমাণু হাইড্রোজেনকে প্রতিস্থাপিত করে। অতএব সোডিয়ামের (Na) যোজ্যতা = 1.

$Mg + 2HCl = MgCl_2 + 2H\uparrow$ সমীকরণটি থেকে দেখা যায় যে Mg-এর একটি পরমাণু দু'টি HCl অণু থেকে দুই পরমাণু হাইড্রোজেনকে প্রতিস্থাপিত করে। অতএব Mg-এর যোজ্যতা = 2.

আবার $Al + 3HCl = AlCl_3 + 3H\uparrow$ সমীকরণটি থেকে দেখা যায় যে এক পরমাণু Al, তিন অণু HCl থেকে তিনটি H পরমাণুকে প্রতিস্থাপিত করে। অতএব Al-এর যোজ্যতা = 3.

যোজ্যতা পরিমাপের ক্লোরিন স্কেল ঃ

সব মৌল তো হাইড্রোজেনের সঙ্গে যুক্ত হয় না, কিংবা কোন হাইড্রোজেনঘটিত যৌগ থেকে হাইড্রোজেন পরমাণুকে প্রতিস্থাপিত করতে পারে না। কিন্তু

অনেক মৌল আছে যারা ক্লোরিন পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে যৌগ গঠন করতে পারে। এমন সব মৌলের যোজ্যতা ক্লোরিন স্কেলে অর্থাৎ ক্লোরিনের যোজ্যতা দিয়ে মাপা হয়।

জিঙ্কের সঙ্গে হাইড্রোজেনের বিক্রিয়া ঘটে না কিন্তু ক্লোরিনের বিক্রিয়া ঘটে। 2টি ক্লোরিন পরমাণু একটি Zn পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে $ZnCl_2$ (জিংক ক্লোরাইড) নামক যৌগ গঠন করে। $Zn + Cl_2 = ZnCl_2$. অতএব এক্ষেত্রে Zn-এর যোজ্যতা = 2.

আবার একটি Al পরমাণু তিনটি ক্লোরিন পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড ($AlCl_3$) যৌগ গঠন করে। অতএব ক্লোরিন স্কেলে Al-এর যোজ্যতা হয় 3.

যোজ্যতা পরিমাপের অক্সিজেন স্কেল ঃ

আবার অনেক মৌল আছে যারা হাইড্রোজেন কিংবা ক্লোরিন, কারুর সঙ্গেই বিক্রিয়া ঘটায় না কিংবা ঘটালেও অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটায়। এমন সব মৌলের যোজ্যতা অক্সিজেন স্কেলে অর্থাৎ অক্সিজেনের যোজ্যতার সাহায্যে মাপা হয়।

আমরা জানি যে একটি অক্সিজেন পরমাণু 2টি H পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে জল (H_2O) নামক যৌগ গঠন করে। কাজেই অক্সিজেনের যোজ্যতা = 2

এখন একটি Mg পরমাণু একটি অক্সিজেন পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে MgO (ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড) যৌগটি গঠন করে। এক্ষেত্রে Mg-এর যোজ্যতা = 2. আবার 2টি Al পরমাণু 3টি অক্সিজেন পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে Al_2O_3 (অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড) যৌগ গঠন করে। এক্ষেত্রে—

$$\text{Al-এর যোজ্যতা} = \frac{\text{যৌগে অক্সিজেনের মোট যোজ্যতা}}{\text{যৌগে Al পরমাণুর সংখ্যা}}$$

$$= \frac{3 \times 2}{2} = 3$$

অতএব Al_2O_3 যৌগে Al-এর যোজ্যতা = 3

আবার ম্যাঙ্গানিজ ডাই অক্সাইড (MnO_2) যৌগে একটি Mn পরমাণু 2টি অক্সিজেন পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হয়। এক্ষেত্রে Mn-এর যোজ্যতা

$$= \frac{\text{যৌগে অক্সিজেনের মোট যোজ্যতা}}{\text{যৌগে Mn পরমাণুর সংখ্যা}} = \frac{2 \times 2}{1} = 4$$

অতএব MnO_2 যৌগে Mn-এর যোজ্যতা = 4

যোজ্যতা প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে ঃ

(i) **সুস্থিত যৌগ গঠন করতে হলে একটি মৌলের সবগুলি যোজ্যতা বন্ড বা বন্ধন অন্য মৌলের সব কটি যোজ্যতা বন্ড বা বন্ধনের সঙ্গে যুক্ত হওয়া দরকার।**

(ii) **যোজ্যতা সব সময় পূর্ণ সংখ্যা হয়, কখনই ভগ্নাংশ হয় না।**

(iii) **যোজ্যতার যে সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা আগে দেওয়া হয়েছে তার থেকে যোজ্যতা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান হয় না। আবার কেবলমাত্র সংকেত থেকে বা বিশ্লেষণের ফল থেকে সব মৌলের যোজ্যতা স্থির করা ঠিক নয়। কার্বন ও হাইড্রোজেনের বিভিন্ন যৌগ হয়। এইসব যৌগের মধ্যে বেন্‌জিন (C_6H_6), ইথিলিন (C_2H_4) ও অ্যাসিটিলিন (C_2H_2) অন্যতম। এইসব যৌগে কার্বনের যোজ্যতা কিন্তু কখনও 1 বা 2 হয় না, সব সময় 4 হয়।**

এখানে আবার একটি নতুন শব্দ 'বণ্ড' (bond) এসে গেলো। পরে গঠনমূলক সংকেতের বিষয় আলোচনার সময় 'বণ্ড'-এর কথা বিশদভাবে বলা হবে। আপাততঃ এইটুকু জেনে রাখলেই চলবে যে, **যৌগের গঠনমূলক সংকেত (Structural formula) লিখবার সময়, পরমাণুর যোজ্যতা যত, তত সংখ্যক হাইফেন (-) চিহ্ন বসানো হয়। এই হাইফেন চিহ্নগুলিকেই পরমাণুর যোজ্যতা বন্ড বা যোজ্যতা বন্ধন বলা হয়।**

একটি এক বণ্ড একটি এক বন্ধনযুক্ত পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হয়। দুটি একবণ্ড একটি দ্বি-বন্ধনযুক্ত পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হয়। তিনটি এক বণ্ড একটি ত্রি-বন্ধন যুক্ত পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হয়।

নীচে কয়েকটি মৌলের যোজ্যতাকে যোজ্যতা বণ্ড বা যোজ্যতা বন্ধন দিয়ে প্রকাশ করে দেখানো হলো।

যোজ্যতা বণ্ড সহ মৌলের চিহ্ন	মৌলের যোজ্যতা	যোজ্যতা বণ্ড সহ ক্লোরিন পরমাণুর সংখ্যা	যৌগের গঠনমূলক সংকেত
—K	1	—Cl	K—Cl পটাসিয়াম ক্লোরাইড
—Ca—	2	2(—Cl)	Ca(Cl)(Cl) ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড
—P— |	3	3(—Cl)	Cl—P(Cl)—Cl ফসফরাস ট্রাই ক্লোরাইড
—Si— |	4	4(—Cl)	Cl(Cl)—Si(Cl)—Cl সিলিকন টেট্রা ক্লোরাইড

যোজ্যতা বণ্ড সহ মৌলের চিহ্ন	মৌলের যোজ্যতা	যোজ্যতা বণ্ড সহ হাইড্রোজেন পরমাণুর সংখ্যা	যৌগের গঠনমূলক সংকেত
—Na	1	—H	Na—H সোডিয়াম হাইড্রাইড
—O—	2	2(—H)	H—O—H জল
—N— |	3	3(—H)	H—N(H)—H অ্যামোনিয়া
—C— |	4	4(—H)	H(H)—C(H)—H মিথেন

পরিবর্তনশীল যোজ্যতা :

অনেক মৌলেরই একাধিক যোজ্যতা হয়। যথা সালফারের যোজ্যতা 2,4,6 ; টিনের (Sn) যোজ্যতা 2,4 ; নাইট্রোজেনের যোজ্যতা 1, 2, 3, 4, 5 ; আবার আয়রনের যোজ্যতা 2 হয়, তিন ও হয়।

একাধিক যোজ্যতাসম্পন্ন কোন মৌলের কম যোজ্যতার দ্বারা গড়া যৌগের অণুকে আস্ (ous) এবং বেশী যোজ্যতার দ্বারা গড়া যৌগের অণুকে ইক্ (ic) যৌগ বলে।

উদাহরণ হিসাবে বলা যায় $FeSO_4$ (ফেরাস সালফেট) যৌগে Fe-এর যোজ্যতা 2, ফেরিক সালফেট [$Fe_2(SO_4)_3$] যৌগে Fe-এর যোজ্যতা 3, অনুরূপভাবে CuCl (কিউপ্রাস ক্লোরাইড) যৌগে Cu এক যোজী কিন্তু $CuCl_2$ (কিউপ্রিক ক্লোরাইড) যৌগে Cu দ্বিযোজী। N_2O যৌগে N এক যোজী, NO (নাইট্রিক অক্সাইড) যৌগে N দ্বিযোজী, N_2O_3 যৌগে N ত্রিযোজী এবং N_2O_4 যৌগে N চতুর্যোজী। আবার H_2S যৌগে S দ্বিযোজী, SO_2 যৌগে S চতুর্যোজী এবং SO_3 যৌগে S ষড়যোজী।

যোজ্যতা অনুযায়ী মৌলের শ্রেণী বিভাগ :

বিভিন্ন মৌলের মধ্যে এক থেকে শুরু করে আট পর্যন্ত যোজ্যতা দেখা যায়। কতকগুলি নিষ্ক্রিয় মৌলের যোজ্যতা শূন্য হয়। যোজ্যতা অনুযায়ী এইসব মৌলকে যথাক্রমে শূন্য যোজী, এক যোজী, দ্বিযোজী, ত্রিযোজী, চতুর্যোজী, পঞ্চযোজী, ষড়যোজী, সপ্তযোজী ও অষ্টযোজী নামে অভিহিত করা হয়। নীচে কতকগুলি সুপরিচিত মৌলের যোজ্যতা দেওয়া হলো। এই মৌলগুলি ভিন্ন অন্যান্য মৌলের যোজ্যতা জানতে হলে তার জন্যে নির্দিষ্ট তালিকা (দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রকাশিত তালিকা) দেখতে হবে।

যৌগ মূলক :

বিভিন্ন মৌলের অনেকগুলি পরমাণু কখনও কখনও পরস্পরের সংগে বিশেষ ধরনের জোটবদ্ধ অবস্থায় থাকে ও সমগ্রভাবে একটি অখণ্ড পরমাণুর মত রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। এই রকম পরমাণু জোটকে যৌগমূলক (Compound Radical) বলে।

নাইট্রেট ($—NO_3$), হাইড্রক্সিল (—OH),
অ্যামোনিয়াম ($—NH_4$), ক্লোরাইড (—Cl),
বাই সালফেট ($—HSO_4$), সায়ানাইড (—CN),
নাইট্রাইট ($—NO_2$) ইত্যাদি সুপরিচিত যৌগমূলকের উদাহরণ।

বিভিন্ন যোজ্যতা সম্পন্ন কতকগুলি মৌল দ্বারা গঠিত যৌগ নীচে দেখানো হলো।

মৌলের চিহ্ন	যোজ্যতা 1	যোজ্যতা 2	যোজ্যতা 3	যোজ্যতা 4	যোজ্যতা 5	যোজ্যতা 6
N	N_2O	NO	N_2O_3	N_2O_4	N_2O_5	—
S	—	H_2S	—	SO_2	—	SO_3
Pb	—	$PbCl_2$ PbO	—	$PbCl_4$ PbO_2	—	—
P	—	—	P_2O_3 PCl_3	—	P_2O_5 PCl_5	—
Fe	—	$FeCl_2$ $FeSO_4$	$FeCl_3$ $Fe_2(SO_4)_3$	— —	— —	— —
Cu	CuCl Cu_2O Cu_2SO_4	$CuCl_2$ CuO $CuSO_4$	—	—	—	—
Sn	—	$SnCl_2$	—	$SnCl_4$	—	—
Hg	Hg_2O	HgO	—	—	—	—

মূলক তড়িৎগ্রস্ত বা প্রশম দুইই হতে পারে। যে মূলক তড়িৎপ্রশম, সেই মূলককে Free radical বা মুক্ত মূলক বলে। মিথাইল (CH_3), ইথাইল (C_2H_5) ইত্যাদি মুক্ত মূলক।

0 শূন্যযোজী	1 একযোজী	2 দ্বিযোজী	3 ত্রিযোজী	4 চতুর্যোজী	5 পঞ্চযোজী	6 ষড়যোজী	7 সপ্তযোজী	8 অষ্টযোজী
He, Ne, Ar, Ze, Kr	H, Cl, Br, I, F, Cu (আস্) Hg (আস্) Na, K, Li Ag	O, Mg, Ca, Sr, Zn, S, Ni, Hg (ইক্), Fe (আস্), Pb (আস্), Cu (ইক্), Sn (আস্), Ba, Cd, Mn (আস), Cr (আস্)	N, P. Al, Cr (ইক্), Fe (ইক্) B, Au, As (আস্) Mn, Bi	C, S, Sn (ইক্), Pt., Pb (ইক্) S Mn	N, P, As (ইক্).	S, Se, Cr, Mn. (এট্),	Mn, Cl	Os

কয়েকটি সুপরিচিত মৌলের যোজ্যতা

তড়িৎগ্রস্ত মূলককে আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায়—পরা তড়িৎগ্রস্ত মূলক ও অপরা তড়িৎগ্রস্ত মূলক। অ্যামোনিয়াম মূলক (NH_4^+) পরাতড়িৎগ্রস্ত মূলক। অপর পক্ষে নাইট্রেট (NO_3^-), সালফেট ($SO_4^{=}$), কার্বনেট ($CO_3^{=}$), ফসফেট ($PO_4^{\equiv}$) ইত্যাদি মূলকগুলি অপরা তড়িৎগ্রস্ত। যৌগমূলকগুলির যোজ্যতাও নির্দিষ্ট থাকে। নীচে বিভিন্ন যৌগমূলকের যোজ্যতা উল্লেখ করা হলো।

সংখ্যা দ্বারা যৌগমূলকের যোজ্যতা নির্ণয় করা যায়। যেমন—

(i) NO_3 মূলকটি একটি H পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে HNO_3 যৌগটি উৎপন্ন করে। এই কারণে NO_3 মূলকের যোজ্যতা = 1. NH_4 মূলকটি একটি Cl পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে NH_4Cl যৌগটি উৎপন্ন করে। অতএব NH_4 মূলকের যোজ্যতা = 1.

(ii) SO_4, CO_3 প্রভৃতি মূলকগুলি দু'টি ক'রে

একযোজী মূলক	দ্বিযোজী মূলক	ত্রিযোজী মূলক
নাইট্রেট—NO_3 , নাইট্রাইট-NO_2 ;	সালফাইড-S ; সালফাইট-SO_3 ;	ফসফেট-PO_4 ;
হাইড্রক্সিল-OH ; বাইকার্বনেট-HCO_3 ;	সালফেট-SO_4 ; কার্বনেট-CO_3 ;	ফসফাইড-P ;
আয়োডাইড-I ; সায়ানাইড-CN ;	সিলিকেট-SiO_3 ; ক্রোমেট-CrO_4 ;	নাইট্রাইড-N
অ্যামোনিয়াম-NH_4 ; সায়ানেট-CNO ;	জিংকেট-ZnO_2 ; ডাই ক্রোমেট-Cr_2O_7 ;	বোরেট-BO_3 ;
ক্লোরেট-ClO_3 ; ক্লোরাইড-Cl ;	ম্যাঙ্গানেট- MnO_4 ;	আর্সেনেট-AsO_4 ;
অ্যালুমিনেট-AlO_2 ; পারম্যাঙ্গানেট-MnO_4;	থায়োফালফেট-S_2O_3 ;	ফেরিসায়ানাইড-
ফ্লুওরাইড-F ; ক্লোরাইড-Cl ;		$Fe(CN)_6$;
ব্রোমাইড-Br ; বাই সালফেট-HSO_4 ;		
বাই সালফাইট-HSO_3 পারক্লোরেট-ClO_4 ;		
ক্লোরাইট-ClO_2 ;		

কয়েকটি যৌগমূলকের যোজ্যতা

মৌলের মত যৌগমূলকের মধ্যেও পরিবর্তনশীল যোজ্যতা দেখা যায়। যথা, [Fe (CN)$_6$] মূলকটির যোজ্যতা 3 হ'তে পারে, আবার 4 হ'তে পারে। K_3 [Fe $(CN)_6$] বা পটাসিয়াম ফেরিসায়ানাইড যৌগে—[Fe $(CN)_6$] যৌগ মূলকের যোজ্যতা = 3. কিন্তু পটাসিয়াম ফেরোসায়ানাইড যৌগে, K_4 [Fe $(CN)_6$] ফেরিসায়ানাইড যৌগ মূলকের অর্থাৎ—[Fe $(CN)_6$] -এর যোজ্যতা = 4.

এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা দরকার। একমাত্র NH_4^+ মূলক ছাড়া পূর্বোক্ত তালিকার অন্তর্গত অন্যান্য মূলকগুলি অপরা তড়িৎগ্রস্ত মূলক এবং যৌগ গঠনে ঐ মূলকগুলি (অপরা তড়িৎগ্রস্ত) অধাতুর মত ব্যবহার করে।

যৌগমূলকের যোজ্যতা নির্ণয় পদ্ধতি :

কোন যৌগমূলক যত সংখ্যক H পরমাণু অথবা C l পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে যৌগ গঠন করে, সেই H পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে যথাক্রমে H_2SO_4 এবং H_2CO_3 যৌগ গঠন করে। অতএব SO_4 এবং CO_3 উভয় যৌগমূলকেরই যোজ্যতা = 2.

(iii) BO_3,PO_4 প্রভৃতি মূলকগুলির প্রত্যেকে তিনটি ক'রে H পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে যথাক্রমে H_3BO_3 এবং H_3PO_4 যৌগ উৎপন্ন করে। অতএব BO_3 এবং PO_4 মূলকগুলির প্রত্যেকটির যোজ্যতা = 3.

(iv) CrO_4, Cr_2O_7 প্রভৃতি মূলকগুলির প্রত্যেকটি দু'টি ক'রে একযোজী K পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে যথাক্রমে K_2CrO_4 এবং $K_2Cr_2O_7$ যৌগ উৎপন্ন করে। সুতরাং CrO_4 এবং Cr_2O_7 মূলকগুলির প্রত্যেকটির যোজ্যতা = 2.

(v) আবার মূলকের অন্তর্গত যে মৌলগুলি থাকে, তাদের মধ্যে ধনাত্মক মৌলের যোজ্যতাকে '+' চিহ্ন এবং ঋণাত্মক মৌলের যোজ্যতাকে '—' চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত ক'রে পরমাণুগুলির সেই যোজ্যতার বীজগাণিতিক

(algebric) যোগফল নির্ণয় করলেই ঐ মূলকের যোজ্যতা পাওয়া যায়। যথা—

PO_4 মূলকে P-এর যোজ্যতা $= +5$,
O-এর যোজ্যতা $= -2$,
সুতরাং PO_4 মূলকের যোজ্যতা $= (+5) + 4\ (-2)$
$= +5 - 8$
$= -3$

অতএব দেখা যাচ্ছে যে PO_4 মূলকটি তড়িৎ ঋণাত্মক ও ত্রিযোজী।

আবার NH_4 মূলকে N-এর যোজ্যতা $= -3$,
H-এর যোজ্যতা $= +1$,
সুতরাং NH_4 মূলকের যোজ্যতা $= -3 + (4 \times 1)$
$= -3 + 4$
$= +1$

অতএব NH_4 মূলকটি তড়িৎ ধনাত্মক ও একযোজী।

॥ প্রশ্নাবলী ॥

1. যৌগিক পদার্থ কাকে বলে? নিম্নলিখিত পদার্থগুলির মধ্যে কোন্ কোন্‌টি যৌগিক পদার্থ?
Na, $CaCl_2$, $(NH_4)_2SO_4$, Mg, FeS, ZnO, P.

2. 'দ্বি-মৌল যৌগ' কাকে বলে? উদাহরণ দাও। আইড (ide) শব্দটি কোন্ শ্রেণীর যৌগের নামের শেষে যুক্ত থাকে?

3. 'যৌগিক পদার্থ সব সময় সমসত্ত্ব হয়'—এই উক্তির অর্থ কি?

4. 'যোজ্যতা' বলতে কি বোঝ? এমন একটি যৌগের নাম ও সংকেত লেখ যাতে হাইড্রোজেনের একটি পরমাণুর সঙ্গে অন্য কোন মৌলের একাধিক পরমাণু যুক্ত আছে।

5. কি কারণে হাইড্রোজেনের যুক্ত হওয়ার ক্ষমতাকে প্রমাণ বা স্ট্যাণ্ডার্ড যোজ্যতা ধরা হয়? ক্লোরিন স্কেল দ্বারা কোন মৌলের যোজ্যতা নির্ণয়ের উদাহরণ দাও।

6. MnO_2 যৌগে Mn-এর যোজ্যতা কতো? এই যৌগে Mn-এর যোজ্যতা কোন্ স্কেলে কি ভাবে নির্ণয় করা হয়েছে? C_6H_6 যৌগে কার্বনের যোজ্যতা কতো?

7. 'যোজ্যতা বণ্ড' বলতে কি বোঝ? যোজ্যতা বণ্ড ব্যবহার ক'রে অ্যামোনিয়া ও ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড যৌগের গঠন সংকেত লেখ।

8. 'একই মৌলের একাধিক যোজ্যতা হতে পারে।' —উদাহরণ দিয়ে এই উক্তির সত্যতা প্রতিপন্ন কর। আস্ (ous) ও ইক্ (ic) যৌগ বলতে কি বোঝ?

9. Cu_2SO_4 যৌগে Cu-এর যোজ্যতা কতো?
$Fe_2(SO_4)_3$ যৌগে Fe-এর যোজ্যতা কতো?
PbO_2 যৌগে Pb-এর যোজ্যতা কতো?
HgO যৌগে Hg-এর যোজ্যতা কতো?

10. দু'টি শূন্যযোজী, একটি পঞ্চযোজী এবং একটি অষ্টযোজী মৌলের নাম লেখ। কোন্ মৌলের যোজ্যতা 1, 2, 3, 4 এবং 5 হয়?

11. 'যৌগ মূলক'-এর সংজ্ঞা লেখ ও উদাহরণ দাও। নিম্নলিখিত যৌগমূলকগুলির নাম লেখ :—
MnO_4, HSO_4, SO_3, ASO_4, ClO_3, CN.

12. নিম্নলিখিত যৌগমূলকগুলির যোজ্যতা কতো?
NH_4, CO_3, PO_4, HCO_3, SO_4, $Fe(CN)_6$.

13. নিম্নলিখিত যৌগমূলকগুলি ব্যবহার ক'রে এক একটি যৌগের আণবিক সংকেত লেখ।
NO_2, OH, ClO_3, HSO_3, SiO_3, ZnO_2.

14. মুক্ত মূলক ও তড়িৎগ্রস্ত মূলকের উদাহরণ দাও। যৌগমূলকের কি একাধিক যোজ্যতা থাকতে পারে? উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

15. নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে '+' এবং '−' চিহ্নগুলির অর্থ কি?
NH_4^+, NO_3^-, $SO_4^{=}$, $PO_4^{\equiv}$

16. নিম্নলিখিত যৌগমূলকগুলির যোজ্যতা কিভাবে নির্ণয় করবে?
PO_4, NH_4, CO_3, NO_3, Cr_2O_7.

17. কিভাবে বোঝা যায় যে PO_4 মূলকটি তড়িৎ ঋণাত্মক ও ত্রিযোজী?

18. $2Al + 3H_2SO_4 = Al_2(SO_4)_3 + 3H_2$
সমীকরণটি হ'তে Al-এর যোজ্যতা কতো, তা নির্ধারণ করা যায় কি?

19. নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলির যোজ্যতা শূন্য ধরা হয় কেন?

20. হাইড্রোজেন স্কেল দ্বারা কিভাবে নাইট্রোজেনের যোজ্যতা নির্ধারণ করা যায়?

21. নিম্নলিখিত যৌগগুলির নাম লেখ :
$HClO_3$, $BaSO_4$, $LiNO_2$, HI, CuS, $NaHSO_4$

আক্রমণই আত্মরক্ষার পথ

টাক যদি আপনার সৌন্দর্য আক্রমণ করে
আপনি তার আগেই টাককে আক্রমণ করুন।
চুলের নিরাপত্তার জন্য ওয়েসিস দুর্গে আশ্রয় নিন॥

ও য়ে সি স

ডাবল এ্যাকশন হেয়ার ফার্টিলাইজার

আর পরীক্ষা করে জেনে নিন ওয়েসিসের বিশেষত্ব

হার্বল রিসার্চ ইনস্টিটিউট আপনার অসুবিধার কথা ভেবেই
দীর্ঘ গবেষণার পর এক আয়ুর্বেদীয় লোশন আবিষ্কার করেছেন,
যা আপনার চুলের সবরকম চাহিদা মেটাতে সক্ষম।

বিজ্ঞাপনে বিভ্রান্ত না হোয়ে
বিনামূল্যে আমাদের এ্যাপলিকেশন সেণ্টারে
এসে পরীক্ষা করুন

ফ্রি এ্যাপলিকেশন সেণ্টার

১। **দি গিভ অ্যান্ড টেক স্টোর্স**
৭এ লিণ্ডসে স্ট্রীট
কলিকাতা-১৩

২। **সঞ্জীবনী**
৫৫৬ ডায়মণ্ড হারবার রোড
বেহালা (অশোকা সিনেমার
কলিকাতা-৩৪ সামনে)

৩। **মাই ফেয়ার লেডি**
লেডিজ বিউটি পারলার
১২৬ রাসবিহারী অ্যাভেন্যু
(উপর তলায়)
(লেক মার্কেট ও দেশপ্রিয় পার্কের
ফোন ঃ ৪৬-৪৬৪১ মাঝামাঝি)

৪। **বেঙ্গল ফার্মেসী**
৬এ, ভূপেন বসু অ্যাভেন্যু

৫। **জ্যোতিশ্রী**
এয়ার কণ্ডিশনড মার্কেট
(একতলায়)
১ শেকসপীয়ার অ্যাভেন্যু
কলিকাতা-১৬

ঃ বিপণনকারী ঃ

ক্যালকাটা ফিল্মলেট এডভারটাইজিং
[মার্কেটিং ডিভিশন]

রেজিস্টার্ড অফিস ঃ
১২, লাউডন স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০১৭
গ্রাম ঃ ফিল্মডম * দূরভাষ ঃ ৪৩২৩৫২
পোঃ বঃ ১৬০৫৩

হেড অফিস ঃ
পারুল এ্যাপার্টমেণ্ট, ফ্লাট ১১
জুহুতারা রোড,
বোম্বাই-৪০০০৪৯

সোজাপথে জ্যামিতি

সিদ্ধার্থ ঘোষ

জ্যামিতির যে-কোন সম্পাদ্য ও উপপাদ্যই প্রমাণ দাবী করে। কিন্তু অঙ্কের বইয়ে যে পদ্ধতিতে প্রমাণ পেশ করা হয় বা কোন জ্যামিতিক চিত্র আঁকার নির্দেশ দেওয়া হয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার চেয়েও সহজ পথে কাজ সারা সম্ভব। এই রকম কয়েকটা ব্যাপার তোমাদের আজ বলব।

ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি

প্রথমেই বলে রাখা ভাল এই প্রমাণটা কিন্তু গাণিতিক প্রমাণ নয়। অঙ্কের খাতায় এইরকম প্রমাণ পেশ করলে জ্যামিতির মাস্টারমশাই নিশ্চয় শূন্য দেবেন। সেটা করো না। কিন্তু এটা প্রমাণ করা যে খুবই সোজা সেটা বুঝতে পারবে।

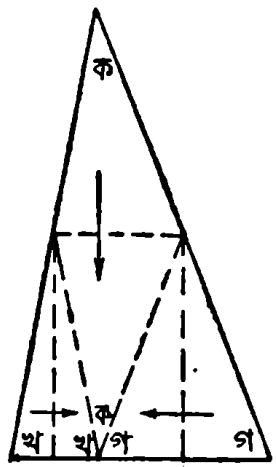

১নং ছবি

যে কোন ধরনের একটা ত্রিভুজ এঁকে নাও কাগজের ওপর। তারপর ত্রিভুজটা কেটে নাও কাঁচি দিয়ে। এবার ১নং ছবির মতো করে ত্রিভুজের তিনটে কোণকে ভাঁজ করো। দেখবে, তিনটে কোণ একসঙ্গে মিলে ত্রিভুজের ভূমির ওপর একটি সরল কোণ তৈরি করেছে। আর সরল কোণ মানেই তো একশো আশি ডিগ্রি।

পীথাগোরাসের উপপাদ্য

পীথাগোরাসের উপপাদ্য তোমরা নিশ্চয় জানো। যে কোনো সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের বর্গ, ওই ত্রিভুজের অন্য দুটি বাহুর বর্গের সমষ্টির সমান। এবার আমরা একটা অদ্ভুত কায়দায় এই উপপাদ্যটাকে প্রমাণ করব। তার জন্যে আমাদের দরকার কাগজ পেন্সিল আর একটা কাঁচি।

প্রথমেই একটা সমকোণী ত্রিভুজ এঁকে ফেলো। তারপর ত্রিভুজটার ছোট বাহু দুটির ওপর দুটি বর্গক্ষেত্র এঁকে নাও (২নং ছবির মতো)। এবার এই বর্গক্ষেত্র দুটির মধ্যে যেটি বড় সেটিকে চারভাগে ভাগ করতে হবে। ভাগ করার জন্য দুটি সরলরেখা টানতে হবে যারা পরস্পরকে সমকোণে ছেদ করবে। তাছাড়া এই ছেদবিন্দুটিকে ওই বর্গক্ষেত্রের কেন্দ্রে থাকতে হবে এবং এই দুটি সরলরেখার মধ্যে একটি হবে অতিভুজের সমান্তরাল (২নং ছবিতে দেখানো হয়েছে)।

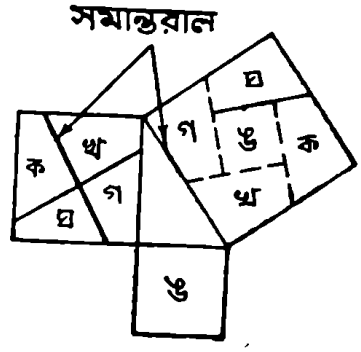

২নং ছবি

এবার ছোট বর্গক্ষেত্রটি এবং বড় বর্গক্ষেত্রটির চারটি অংশ কেটে নিতে হবে কাঁচি দিয়ে। এবার এই টুকরো-গুলোকে ঠিক মতো জড়ো করলেই দেখা যাবে তারা অতিভুজের ওপর একটি বর্গক্ষেত্র তৈরি করেছে।

হল তো? কিন্তু আবার মনে করিয়ে দিই, এটা কিন্তু গাণিতিক প্রমাণ নয়।

উপবৃত্ত আঁকা

বৃত্ত আঁকা খুবই সোজা। একটা কম্পাস থাকলেই হল। কিন্তু খুব সহজে উপবৃত্ত কি করে আঁকা যায় সেটাই তোমাদের বলে দিচ্ছি।

কাঠের টেবিলে একটা কাগজ রেখে তার ওপর দুটো পিন গেঁথে দাও। এক টুকরো সুতো নিয়ে এবার তার মুখ দুটোয় গিঁট লাগিয়ে নাও। সুতোর মালাটা পিনের ওপর পরিয়ে দিয়ে একটা পেন্সিলের মুখের সাহায্যে সুতোটাকে টান্ করে ধরো। যেমন দেখানো হয়েছে ৩নং ছবিতে। এবার সুতোটা টান্ করে রেখে পেন্সিলটাকে আস্তে আস্তে পিনের চারধার দিয়ে ঘুরিয়ে গেলেই দেখবে একটা নিখুঁত উপবৃত্ত এঁকে ফেলেছো।

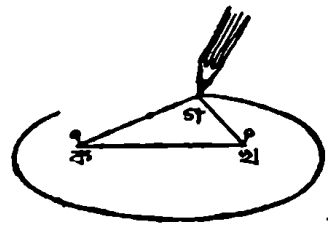

৩নং ছবি

উপবৃত্ত আঁকার এই পদ্ধতিটাই বলে দেয় উপবৃত্তর জ্যামিতিক চরিত্রের কথা। যে কোন উপবৃত্তের দুটি নাভি (ফোকাস) বিন্দু থাকে। এই নাভিবিন্দু দুটি থেকে উপবৃত্তের ওপর যে কোন বিন্দু অবধি যদি দুটি সরলরেখা টানা যায়, তবে এই সরলরেখা দুটির দৈর্ঘ্যের

সমষ্টি সবসময়েই সমান থাকবে। আমাদের ছবিতে যেখানে পিন দুটি গাঁথা হয়েছে, অর্থাৎ ক ও খ হল উপবৃত্তের নাভিবিন্দু। আর সুতোর কগ ও খগ অংশ হল দুটি সরলরেখা যা নাভিবিন্দু দুটি থেকে উপবৃত্তের ওপরকার গ বিন্দু অবধি টানা হয়েছে। সুতোর কখ অংশের দৈর্ঘ্যে কখনোই কোনো তফাত ঘটবে না, তাই উপবৃত্ত আঁকার সময় পেন্সিলটা যেখানেই থাকুক না কেন কগ ও খগ অংশের যোগফলেরও কোন তারতম্য হবে না।

পিন দুটোকে যদি আরো কাছাকাছি গাঁথা হয় আর সুতোর দৈর্ঘ্য পরিবর্তন করা না হয় তাহলে দেখা যাবে উপবৃত্তটার চেপ্টা ভাবটা কমে এসেছে। পিনগুলো যত কাছাকাছি গাঁথা হবে চেপ্টা ভাবটাও ততই কমবে। শেষকালে নাভিবিন্দু দুটি যখন এক হয়ে যাবে তখন দেখা যাবে একটা বৃত্ত তৈরি হয়েছে, যার ব্যাসার্ধ সুতোর দৈর্ঘ্যের অর্ধেক।

বৃত্তের কেন্দ্র বার করা

কম্পাস ব্যবহার করে যে-কোন বৃত্তের কেন্দ্র বার করা যায়। সেই পদ্ধতি তোমরা নিশ্চয় সবাই জানো। কিন্তু আমি তোমাদের একটা শর্টকাট্ কায়দা শিখিয়ে দেব।

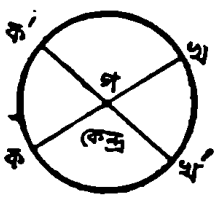

৩নং ছবি

বৃত্তের পরিধির ওপর এক টুকরো কাগজের একটা কোণকে বসিয়ে দাও। খেয়াল রেখো কাগজের টুকরোটা যেন বর্গাকার বা আয়তাকার হয়। কাগজের বদলে একটা সেট্‌স্কোয়ারও ব্যবহার করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে সেটস্কোয়ারের নব্বই ডিগ্রি কোণটাকে ঠেকাতে হবে বৃত্তের পরিধির যে কোন বিন্দুতে। এবার ৪নং ছবির মতো 'ক' এবং 'খ' বিন্দুকে চিহ্নিত করে নাও। এই 'ক, ও 'খ' বিন্দুতেই কাগজের টুকরোটা বা সেট্ স্কোয়ারের দুটি বাহু বৃত্তটিকে ছেদ করেছে। এই 'ক' ও 'খ' বিন্দু যোগ করলে বৃত্তটির একটি ব্যাস পাওয়া যাবে। কেন? কারণ, বৃত্তের পরিধির ওপর যে কোনো একটি বিন্দুকে যদি যে-কোন ব্যাসের দুই প্রান্তের সঙ্গে যুক্ত করা হয় তবে বৃত্তের পরিধিতে একটি সমকোণ তৈরি হয়।

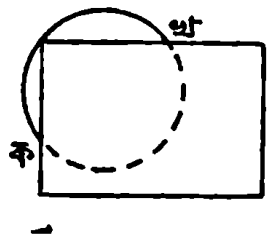

৪নং ছবি

এবার কাগজের টুকরোর বা সেট স্কোয়ারের নব্বই ডিগ্রি কোণটিকে বৃত্তের পরিধির ওপর অন্য যে কোনো বিন্দুর ওপর বসাও। যাতে, বৃত্তের আরেকটি ব্যাস পাওয়া যায়। এই দুটি ব্যাস্ যে বিন্দুতে পরস্পরকে ছেদ করবে সেটি বৃত্তের কেন্দ্র। যেমন ৫নং ছবিতে ব্যাস 'কখ' ও 'ক'খ'' 'গ' বিন্দুতে পরস্পরকে ছেদ করেছে। তাই 'গ' বিন্দুটি এই বৃত্তের কেন্দ্র।

বিজ্ঞানের টুকিটাকি

লেসার রশ্মি দিয়ে আঙুলের ছাপ

প্রচলিত পদ্ধতিতে আঙুলের ছাপ তুলতে গিয়ে যদি কোন অসুবিধে দেখা দেয়, তবে লেসার রশ্মি ব্যবহার করে ফল পাওয়া যেতে পারে—অন্তত সাম্প্রতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা তাই প্রমাণ করেছে।

দেখা গেছে, মানুষের হাতে প্রতিপ্রভ কোন পদার্থের ছোঁওয়া থাকবেই। সাধারণতঃ এই প্রতিপ্রভ পদার্থ আসে তেল. কালি বা রঙ ইত্যাদি থেকে। আবার কোন কোন মানুষের শরীর থেকেও এই পদার্থ নিঃসৃত হয়। প্রতিপ্রভ পদার্থ থেকে যে আঙুলের ছাপ তৈরী হয়, তা সহজে নষ্ট হয় না। এর ওপরে লেসার রশ্মি প্রয়োগ করলে প্রতিপ্রভ পদার্থের পরমাণুগুলো রশ্মির কিছুটা শক্তি ফিরিয়ে দেয় আলো হিসেবে। তখন এই আলো দিয়ে তৈরী আঙুলের ছাপ বিশেষ যন্ত্রে সহজেই দেখা যায় বা ছবিও তুলে রাখা যায়।

বর্তমানে এই বিষয়ে আরও গবেষণা চলবে ক্যানাডার 'জাতীয় গবেষণা পরিষদ'-এর জীবন বিজ্ঞান বিভাগে।

পারমাণবিক ঘড়ি

সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়

ছোটকা ঘরে ঢুকেই জিজ্ঞেস করলেন 'কার ঘড়িতে কটা বেজেছে ?' বিনু ওর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো 'চারটে পঁচিশ'। ঝুমা ওর নতুন উপহার পাওয়া ভারি সুন্দর ইলেকট্রনিক ঘড়িতে সময় দেখে বললো 'উঁহু, তোর ঘড়ি স্লো চলেছে। আমার ঘড়িতে এখন চারটে সাতাশ'। পিনুও কম যায় না। সে মাঝখান থেকে বলে উঠলো, 'না' ছোটকা, ওদের কারো ঘড়িই ঠিক নেই। আমার ঘড়িতে এখন পাক্কা চারটে চব্বিশ।'

ছোটকা তার হাতের বড় প্যাকেটটা টেবিলে নামিয়ে খুলতে খুলতে শুধু হাসলেন, কোন জবাব দিলেন না। প্যাকেটটা খোলা হতেই বেরিয়ে পড়লো বড় একটা বাক্স। সবাই তো উদগ্রীব হয়ে ছোটকার কাজ দেখছে, ব্যাপারটা যে কি ওরা বুঝতেই পারছে না। ছোটকা এবার বাক্সটার ঢাকনা খুলে কিছু দেখে নিয়ে বলে উঠলেন সকলের দিকে একবার তাকিয়ে, 'এখন সময় হলো ঠিক চারটে বেজে পঁচিশ মিনিট আটত্রিশ দশমিক একুশ সেকেণ্ড।'

ঝুমা, বিনু আর পিনুর মুখ দেখে হাসি চাপতে পারলেন না এবার ছোটকা। হো হো করে হেসে বললেন, 'খুব অবাক হয়ে গেছিস তোরা সবাই, না ? এটা হলো পারমাণবিক ঘড়ি। দোকানে দেখেই আসার পথে কিনে ফেললাম। মনে রাখিস পৃথিবীর সবচেয়ে নির্ভুল ঘড়ি হলো এটাই।'

ঠিক আজকের ঘটনা না হলেও এমন কিছু হয়তো অদূর ভবিষ্যতেই ঘটবে। তখন দোকানে দোকানে কিনতে পাওয়া যাবে এরকম নির্ভুল পারমাণবিক ঘড়ি।

ব্যাপারটা আদৌ কল্প কাহিনী নয়। মানুষের প্রয়োজনে যেসব জিনিস আবিষ্কার হয়েছে তার মধ্যে ঘড়িই মানুষের একান্ত ভাবে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস হলেও দীর্ঘদিন মানুষ হিমসিম খেয়েছে একেবারে নিখুঁত, নির্ভুলভাবে সময় গণনা করতে। সেই আদ্যিকাল থেকে যখন চল ছিল সূর্যঘড়ির, তখন থেকেই মানুষ সঠিক সময় গণনার চেষ্টা চালিয়েছে। কিন্তু চিরকালই দেখা গেছে মানুষের তৈরি যন্ত্র নির্ভুল সময় দিতে মোটেও পারে নি। আধুনিক কালে সাধারণ ঘড়ির সঙ্গে চালু হয়েছে ইলেকট্রনিক ঘড়ি। কিন্তু মূল সমস্যা কিন্তু রয়েই গেছে —সঠিক সময় কি ?

বিজ্ঞানীরা তাই বসে থাকেন নি, তারা অতি নিঃশব্দে ব্যাপারটা নিয়ে চালিয়ে গেছেন গবেষণা। শেষ পর্যন্ত তাঁরা সফলও হয়েছেন সময়ের একটা স্থির সমন্বয় সাধন করে নির্ভুল বিজ্ঞান নির্ভর কিছু করতে। এজন্য তারা শেষ পর্যন্ত আবিষ্কার করেছেন পারমাণবিক ঘড়ি। এ ঘড়ি সম্পূর্ণভাবেই পরমাণুতত্ত্বের উপর নির্ভরশীল। বিজ্ঞানীরা সময় নিয়ে পরীক্ষার জন্য এই রকম ধাতব বাক্সে রাখা পারমাণবিক ঘড়ি পৃথিবীর নানা প্রান্তে গড়ে তোলা সময়ের কেন্দ্রগুলিতে আনা নেয়া করেও চলেছেন। পারমাণবিক ঘড়ির সময় সংক্রান্ত প্রধান দপ্তর গড়ে উঠেছে ফ্রান্সের প্যারী শহরে। এখানেই রয়েছে পারমাণবিক ঘড়ির আন্তর্জাতিক দপ্তর বা ইণ্টারন্যাশনাল ব্যুরো অব টাইম। এই দপ্তরের প্রধান দায়িত্ব সারা দুনিয়ায় সময়ের সমন্বয় গড়ে তোলা।

গত দশকে পারমাণবিক ঘড়ির গবেষণা আর তার ফলাফল নিঃশব্দ এক বিপ্লবই ঘটিয়েছে সময় ঠিক রাখার কাজে। আজকের দুনিয়ার প্রায় প্রতিটি দেশই পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ যেভাবেই হোক সময়ের গণনা করে থাকে পরমাণুর কাজের উপর নির্ভর করে, নক্ষত্রের গতিবেগের উপর আস্থা না রেখেই।

পারমাণবিক ঘড়িতে সাধারণ ঘড়ির মতো স্প্রিং, চক্র বা গীয়ারের কোন দরকার হয় না। অবশ্য ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে খুবই জটিল। অথচ পারমাণবিক ঘড়ির পিছনে পদার্থবিদ্যার যে নীতি কাজ করছে তা মোটেও পরমাণুর বিভাজন বা গলন, এর কোনটাই নয়। খুব সহজ কথায় বললে ব্যাপারটা হলো, কিছু কিছু রাসায়নিক মৌলে তাদের পরমাণুর মধ্যের ইলেক্ট্রন কেন্দ্রীনের বাইরের অংশে লাট্টুর মতোই প্রচণ্ড বেগে ঘুরে চলে। আর লাট্টুর মতোই ঘুরতে ঘুরতে স্থান পরিবর্তনও করে—সেটাও এক নির্দিষ্ট সময় অন্তর। যেমন ধরা যাক কেসিয়ামের পরমাণু। এই নরম রূপোর মতো ধাতুই পারমাণবিক ঘড়িতে ব্যবহার করা হয়। এই স্থান পরিবর্তন ঘটে প্রতি সেকেণ্ডে ৯, ১৯২, ৬৩১, ৭৭০ বার। কোন যন্ত্রের সাহায্যে সহজে এর পরিমাপ করা অসম্ভবই প্রায়। এই নীতির উপর নির্ভর করেই পারমাণবিক ঘড়ি তৈরি করা হয়েছে।

দশ বারো বছর আগেও দুনিয়ার মানুষ সময় ঠিক করেছে জ্যোতির্বিদ্যার উপর নির্ভর করে। সেটাই আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত। ১৮৮৪ সালে এক সেকেণ্ডকে মনে করা হতো পৃথিবীকে তার চক্রের উপর নির্ভর করে একবার ঘুরতে যে সময় লাগে তাই। সেই সময় হলো ১/৮৬,৪০০। এটাই পৃথিবীর আহ্নিক গতি—অতএব ২৪

ঘণ্টার একদিনে থাকে ৮৬,৪০০ সেকেণ্ড। কিন্তু পৃথিবী তার আহ্নিক গতির সময় স্থান পরিবর্তন করে আর সেটাও এলোমেলো ভাবে। এর জন্য দায়ী সৌর বায়ু, জোয়ার ভাটা, ভূমিকম্প—এই সবই। তাই ১৯৬০ সালে আহ্নিক গতি অনুযায়ী সময় নির্ধারণের পথ বদলে পৃথিবীর বার্ষিক গতিকেই গ্রহণ করা হলো। সেকেণ্ডকে তাই নতুন করে বলা হলো ১।৩১,৫৫৬,৯২৫·৯৭৪৭। একবছরে অতএব রয়েছে ৩৬৫ আর একদিনের কিছু ভগ্নাংশ বা ৩১৫·৫ লক্ষ সেকেণ্ড। কিন্তু সমস্যা এতেও রইলো। কারণ পৃথিবীর আহ্নিক বা বার্ষিক গতি মাপা হয় পৃথিবীতে থেকেই। যদি সূর্য থেকে দেখা যেত তাহলে কাজটা অবশ্যই নির্ভুল হতো। অতএব এই গতি মাপার সময় পৃথিবী তো অনবরত স্থান পরিবর্তন করে চলে তাই নির্ভুল গতিবেগ মাপা খুবই কঠিন কাজ। অতএব কোন কোন মহল বলে ফেললো সেকেণ্ডকে ১/৩১,৫৫৬,৯২৫·৯৭৪৭ অংশে ভেঙে ফেললেই তো ঝামেলা চুকে যায়। কিন্তু এটা হবার নয়—কারণ প্রাচীন কাল থেকেই তা সে সৌর ঘড়ি বা দোলক ঘড়ি যাই হোক না কেন বেশ কিছু সময়ের কমবেশি হেরফের হয়ে থাকে, সেটা দৈনিক দশ মিনিট থেকে আধ ঘণ্টাও হওয়া সম্ভব। ইলেকট্রনিক ঘড়িতে এই ভুলের সম্ভাবনা এক ঘণ্টায় এক সেকেণ্ডের দশলক্ষ ভাগের এক ভাগ কমানো হলেও মাঝে মাঝে একে যাচাই করারও দরকার হয়ে পড়ে। অতএব পারমাণবিক ঘড়িই একমাত্র নির্ভরশীল ঘড়ি বলে মনে করা হয়—কারণ এতে এরকম ভুলের সম্ভাবনা নেই।

পারমাণবিক ঘড়ি আবিষ্কার সফল হয়ে ওঠে আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নোবেল পুরস্কার বিজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী ইসিডর র‍্যাবীর পরীক্ষার ফলে। ১৯৩০ সালে তিনি দেখেন যে কেসিয়ামের পরমাণুর ইলেকট্রনকে প্রচণ্ডভাবে লাট্টুর মত ঘোরার মুখে আঘাত করলে সেটা একই গতিতে উল্টোদিকে ঘুরতে থাকে। এটা করা যায় কিছু সমান গতিবেগের বেতার তরঙ্গ দিয়েই। ওই ইলেকট্রনের ঘোরার গতি হলো প্রতি সেকেণ্ডে ৯,১৯৩,০০০,০০০ বার। র‍্যাবী দেখলেন এর সাহায্যে নির্দিষ্ট মাপের এক তরঙ্গের একক ধরে নেওয়া সম্ভব। শুধু বিজ্ঞানীদের জানা দরকার ছিল প্রতি সেকেণ্ডে ওই ইলেকট্রন কতবার স্থান পরিবর্তন করে।

১৯৫৫ সালে আমেরিকার উইলিয়াম মার্কোভিৎস আর ইংলণ্ডের লুই এসেন কেসিয়াম নিয়ে পরীক্ষা করার পর জানিয়ে দিলেন এক জ্যোতির্বিদ্যার সেকেণ্ডে ওই ইলেকট্রন ৯,১৯২,৬৩১,৭৭০ বার স্থান পরিবর্তন করে। ১৯৬৭ সালে প্রায় চল্লিশটি দেশের বিজ্ঞানীরা প্যারী শহরে জমায়েত হয়ে এই ব্যাপারটি মেনে নিয়েছেন। ১৯৭২ সালের ১লা জানুয়ারী প্যারী শহরেই নতুন এক ধরনের সময় 'সমন্বয়িত আন্তর্জাতিক সময়': (ইউ. টি. সি.) রাখা সুরু হয়। এটা করা হলো পৃথিবীর মোট ১৮টি দেশে রাখা পারমাণবিক ঘড়ির সময় দেখেই। ইউ. টি.সি সময়ে প্রতিদিন এক সেকেণ্ডের সহস্র লক্ষ ভাগের এক ভাগ সময়ও কমবেশি হয় না। অতএব পারমাণবিক ঘড়ি প্রায় নির্ভুল।

খুব ইদানীং কালে পারমাণবিক ঘড়ি নতুন করে আলোকের গতি ঠিক করে দিয়েছে। সেটা হলো তিন কিলোমিটার প্রতি সেকেণ্ডে। শুধু কি এটাই? এ আইনস্টাইনের তত্ত্বের কিছু ব্যাখ্যাও করতে পেরেছে। ১৯৭১ সালে দু'জন বিজ্ঞানী চারটি পারমাণবিক ঘড়ি নিয়ে প্রথমে আমেরিকা থেকে পূব দিকে যাত্রা করেন। তাঁরা দেখলেন আইনস্টাইন যে রকম বলেছিলেন, ঘড়িগুলো এক সেকেণ্ডের বেশ কয়েক লক্ষ ভাগের কিছু বাড়িয়ে বসেছে। আবার তারা পশ্চিমে উড়ে যেতেই দেখা গেলো ঘড়িগুলো কিছু সময় লাভ করেছে।

মানুষ আজ অবিশ্বাস্য রকম দ্রুতবেগে মহাকাশ অভিযান করে চলেছে। পারমাণবিক ঘড়ি একাজে তাদের মস্ত সহায়। নিখুঁত সময় অনুযায়ী মহাকাশ যান চালানোর ক্ষেত্রে পারমাণবিক ঘড়ির সাহায্য অমূল্য। পারমাণবিক ঘড়ি জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রে নতুন নতুন ভাবনার জন্ম দিয়েছে।

পারমাণবিক ঘড়ির ব্যাপারে এখনও কিন্তু বহু গবেষণা বাকি; সব কাজ শেষ হয়ে যায় নি এখনও। গবেষণা তাই এখনও চলেছে।

১৫৯/১বি, বকুল বাগান রোড, কলিকাতা-২৫

শক্তি কোথায় পাই

সূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র

সারাদিন পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ কাজেকর্মে ব্যস্ত রয়েছে—তাদের সেই শক্তি কোথা থেকে আসে? এ প্রশ্নের সহজ উত্তর হল খাদ্য থেকে। সব দেশের সরকার এই খাদ্য যোগান দিতে ব্যস্ত। খাদ্য বলতে প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ যে সব পদার্থ আমরা গ্রহণ করি তাদের অস্তিত্বের সঙ্গেও জড়িয়ে আছে শক্তি, তার উৎস হল সূর্য। সূর্যের আলোর শক্তি সঞ্চিত হয় উদ্ভিদে। ফটোসিন্থেসিস্ বা আলোক সংশ্লেষণ পদ্ধতিতে উদ্ভিদের ক্লোরোফিল সূর্যের আলো শুষে নিয়ে উদ্ভিদের উপাদান কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জল অণুদের ভেঙে শর্করা ও অক্সিজেন অণুতে রূপান্তরিত করে। উদ্ভিদে সূর্যের শক্তিই খাদ্য হিসেবে আমাদের শক্তি যোগায়। প্রাণীরা অক্সিজেন ও উদ্ভিদের খাদ্য খেয়ে বাঁচে ও বাড়ে। তাই প্রাণিজ খাদ্য থেকে যে শক্তি পাই তার উৎসও পরোক্ষে সূর্যই।

মানুষের বাঁচা ও বাড়া তাই সূর্যের ওপর একান্তই নির্ভরশীল। পৃথিবীতে মানুষের অভ্যুদয় ঠিক কবে হয়েছে তা বলা যায় না। তবে পণ্ডিতদের ধারণা প্রায় দশলক্ষ বছর আগে পৃথিবীর ইতিহাসে মানুষের বিবর্তন ঘটেছে। পৃথিবী সৃষ্টির কাল আজ থেকে প্রায় ৪৬০—৫০০ কোটি বছর আগে। ভূতাত্ত্বিক নিরিখে প্রাণের অভ্যুদয় ঘটেছে প্রায় ৫৭ কোটি বছর আগে। তার আগের অংশ প্রাক্ ক্যাম্ব্রিয়ান যুগ। এই সময়ে প্রাণের সৃষ্টি হয়ে থাকলেও তার ইতিহাস জানা নেই। আজ থেকে ৫৭ ও ২২·৫ কোটি বছরের মধ্যবর্তী সময় হল পেলিওজোইক বা পুরাপ্রাণ যুগ। ২২·৫ থেকে ৬·৫ কোটি বছর সময় কাল হল মেসোজোইক বা মধ্যপ্রাণ যুগ। ৬·৫ কোটি বছর আগে যে সিনোজোইক বা নবপ্রাণ যুগের অভ্যুদয়, মানুষ যেখানে প্রায় নবাগত বলতে হ'বে।

প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে মানুষ যখন শ্রম কমাতে পাথরের যন্ত্রপাতি ব্যবহার শিখল তখন থেকে প্রস্তর যুগের আরম্ভ। নব প্রস্তর যুগে অনুমান বারো থেকে কুড়ি হাজার বছর আগেকার দক্ষিণ ফ্রান্স ও স্পেনের পার্বত্য গুহায় যে দেওয়াল চিত্র পাওয়া গেছে—তা হল বাইসন বা ম্যামথ্ জাতীয় বড় বড় বন্যজন্তু ধরার ফাঁদ। ফাঁদগুলি এমন ভাবে তৈরী যে জন্তুটি ফাঁদে ঢুকলে লেভারের সাহায্যে গাছের গুঁড়ি ফেলে তার বাইরে যাবার পথ বন্ধ করা যায়। অবশ্য লেভারের কৌশল পাথর বা গাছ থেকে তৈরী হয়।

এই চিত্র থেকে বোঝা যায় যে, বুদ্ধিমান মানুষ বন্য জন্তুর শক্তি কাজে লাগাতেও আদিম কাল থেকে চেষ্টা করেছে। নব প্রস্তর যুগে পাথরের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে শস্য উৎপাদন ও শক্তি সংগ্রহ করার আর একটি পদ্ধতি অবিষ্কারও সে যুগের মানুষের কৃতিত্ব।

কৃষির প্রসার ও বন্যপ্রাণীর ব্যবহার মানুষকে যথেষ্ট শক্তি যুগিয়েছে সন্দেহ নাই। তবু মধ্যযুগে মানুষের হাতের শক্তিকেই প্রাধান্য দেওয়া হত। তাই বিজিত রাজ্যের বন্দীরা দাস হিসাবে ছিল বিজয়ী রাজ্যের অন্যতম শক্তির উৎস।

আগুনের আবিষ্কারে মানুষ রান্না শিখলো—ধীরে ধীরে বনের কাঠ জ্বালিয়ে আগুনের বিভিন্ন ব্যবহারও সম্ভব হল। কাঠ থেকে পোড়া কয়লা উৎপন্ন করে সেই জ্বালানীতে লোহা গলানো এমন কি আঠারো শতকেও ব্রিটেনের একমাত্র পদ্ধতি ছিল যার উপর সে দেশের অর্থনীতি বহুলাংশে নির্ভর করত।

কৃষি, জীবজন্তু, বনের সম্পদ এসব দিয়ে মানুষের খাদ্য যে আর যোগান যাবে না, ১৭৯৮ খৃস্টাব্দে ম্যালথাস্ স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী করলেন। যেভাবে তখন পৃথিবীর জনসংখ্যা বাড়ছে, মানুষের দৈহিক শক্তির উপর নির্ভর করে তার ভরণপোষণ যে চলতে পারে না, কৃষি বা পশু সম্পদ থেকেও সেই জনস্ফীতির মোকাবিলা যে সম্ভব নয় তা অনেক জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিই প্রচার করছিলেন। তাহলে সূর্যের শক্তির এই সহজ রূপান্তরে যে খাদ্য সহজ লভ্য ছিল, তা আর পর্যাপ্ত নয়। কৃষির ফসল বাড়াতে হবে। কাঠকয়লা জ্বালিয়ে লোহার ছোটখাট শিল্প যে-সব গড়ে উঠেছিল বন ফুরিয়ে আসায় সে-সব শিল্পেরও অন্তিমদশা আরম্ভ হল।

এখন যান্ত্রিক উপায়ে শিল্পের ও কৃষির উন্নতি ঘটাতে চাই নতুন নতুন যন্ত্র। এ সব যন্ত্র মানুষের দৈহিক শক্তি বা পশুর শক্তি দিয়ে চলবে না। কিন্তু এসব যন্ত্র চালাতে চাই নতুন জ্বালানী। আঠার শতকেই এরকম নতুন জ্বালানীর সন্ধান পাওয়া গেল—তা হল কয়লা। পুরাপ্রাণ যুগে এখন থেকে ৩৪·৫—২৮ কোটি বছরের মধ্যে কার্বনিকেরাস অধিযুগের ব্যাপ্তি। ঐ সময় স্থলভাগের উদ্ভিদরাজি মাটি চাপা পড়ে জীবাশ্মে বা ফসিলে পরিণত হয়ে কয়লায় রূপান্তরিত হয়েছে। এখানেও শক্তির উৎস সূর্য—সেই শক্তি উদ্ভিদের ফসিলে কয়লার শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। মধ্যপ্রাণ যুগে বাদামী কয়লা ও লিগ্‌নাইটের উৎপত্তি একই পদ্ধতিতে ঘটেছে।

যে সব উদ্ভিদ প্রধানত ব্যাপক সময়ে এভাবে জীবাশ্মে পরিণত হয়ে বনাঞ্চল থেকে জলাজমিতে বাহিত হয়ে স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়েছে, পরে জলাজমির ভূ-পরিবর্তনের পর কয়লার খনিতে পরিণত হয়েছে। আলোক বিশ্লেষণে সূর্যালোকের যে শক্তি কার্বন হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন হিসেবে উদ্ভিদের উপাদান ছিল, জীবাশ্মে রূপান্তর হয়ে সে সব উপাদান জল মিথেন ও কার্বন ডাই অক্সাইডের আকারে ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়। ফলে কয়লায় বিশুদ্ধ কার্বন মাত্র থাকে। উঁচুমানের এ্যনথ্রাসাইটে দেখা যায় ওজন অনুযায়ী অনুপাত কার্বন ৯৩·৫, হাইড্রোজেন ৩·৫, অক্সিজেন ১, নাইট্রোজেন ১·২, গন্ধক ০·৮। সাধারণ কাঠে এই অনুপাত তুলনা করলে যথাক্রমে ৪৯·৮, ৬·৯, ৪৩·৪, ০·৩, ০·৩। ঐ কয়লা ও কাঠের উৎপত্তি মূল উদ্ভিদ হলেও তাদের জ্বালানী হিসাবে ক্যালোরীয় মান হল যথাক্রমে কিলোগ্রাম প্রতি ৯·৮৮ ও ৫·৩২ কিলোওয়াট্-ঘণ্টা। জ্বালানী হিসেবে তাই কয়লা সাধারণ কাঠের চেয়ে অনেক উৎকৃষ্ট, তাছাড়া ভূগর্ভে ১০ মিটার থেকে ৩০ সেণ্টিমিটার পুরু কয়লার স্তর যে শক্তির উৎস তার সমমান বনাঞ্চল পৃথিবী পৃষ্ঠে বিরাট আয়তন দখল করে থাকবে।

হাইড্রোকার্বন ঘটিত তেল ও গ্যাসকে আমরা পেট্রোলিয়াম বলি। পুরাপ্রাণ যুগে এমন কি প্রাক্ ক্যাম্ব্রিয়ান যুগে সামুদ্রিক জৈব পদার্থের অবশেষ ফসিল বা জীবাশ্ম রূপে পেট্রোলিয়ামে পরিণত হয়েছে। কয়লার অনেক কাল আগেই তাই পেট্রোলিয়ামের সৃষ্টি। এই সব জৈব পদার্থ ব্যাকটিরিয়ার সাহায্যে ক্ষয় পেয়ে তৈরী হয়েছে পেট্রোলিয়াম ও পরে ৭।৮ হাজার মিটার গভীরে সঞ্চিত হয়ে অজৈব পদার্থের ভারে চাপা পড়ে গেছে। এই সঞ্চয় কিন্তু বড় বড় কূপ বা হ্রদের আকারে থাকে না। সছিদ্র শিলার ফাঁকে ফাঁকে থাকে।

কয়লা তেল ও গ্যাস এইসব জীবাশ্ম বা ফসিল একদা সূর্যের শক্তি সঞ্চয় করেছিল—সেই শক্তিই আমরা আঠার শতক থেকে কাজে লাগিয়ে আসছি। এসব জ্বালানী আবিষ্কার হওয়ায় পৃথিবীতে শিল্পবিপ্লব ঘটেছে—কৃষিতেও এসেছে বিপ্লব। সভ্যতা ও সংস্কৃতির উঁচুমান নিয়ে পৃথিবীর মানুষ সুখীই ছিল।

বিশ শতকের শেষে আবার প্রশ্ন উঠেছে কয়লা তেল এসব জ্বালানী তো আর অফুরন্ত নয়, প্রায় ফুরিয়েও আসছে। এসব জ্বালানীর দৌলতে মানুষের বিলাস ব্যসন বেড়ে গেছে। মানুষের সংখ্যাও বাড়ছে, তাহলে নতুন কোন জ্বালানী খুঁজে পেতে হবে, যার সাহায্যে আমাদের কয়লা বা তেল না হলেও চলে। নতুন যে জ্বালানী কাজে লাগানো হচ্ছে তাহ'ল পরমাণুর নিউক্লিয়াস বিভাজনের শক্তি। হাল্কা নিউক্লিয়াস জুড়ে গিয়েও প্রচুর শক্তির উৎপাদন হতে পারে, তার প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণাই চলেছে —সাফল্য আসে নি। কেউ কেউ বলছেন সূর্যের শক্তিই আমরা পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহার করে আসছি। সেই শক্তি থেকে বিদ্যুৎ তৈরী করা যাক্ না অথবা সোজাসুজি তা দিয়ে এঞ্জিন চালানো যাক্ না কেন? তা নিয়ে গবেষণা চলছে কিন্তু কয়লা বা তেলের বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করার সম্ভাবনা এখনও দেখা যাচ্ছে না।

এতদিন আমরা যে শক্তি ব্যবহার করেছি তার মূল হল উদ্ভিদ যার শক্তি সংগ্রহের পদ্ধতি হল আলোক বিশ্লেষণ ক্রিয়া। আমরা সেই ক্রিয়া কাজে লাগিয়ে শক্তি উৎপাদন করতে চেষ্টা করি না কেন?

সাধারণ কৃষি উৎপাদনে সৌরশক্তি শস্যে যে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয় তার দক্ষতা শতকরা মাত্র ০.১ ভাগ। বিজ্ঞানীরা মনে করেন এই দক্ষতা ৩ থেকে ৫ ভাগে বাড়ানো যাবে। বিজ্ঞানী জর্জ জেগো একটি শক্তি উদ্যানের পরিকল্পনা করেছেন যার গাছগুলিতে সূর্যের শক্তি শতকরা ৩ ভাগ দক্ষতায় সঞ্চিত হবে। এরকম ৪০ বর্গ মাইলের একটি উদ্যান থেকে ৭·৪ কোটি টন কয়লার সমমান শক্তি পাওয়া যাবে। তা দিয়ে একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র তার আয়ুষ্কাল ৩০ বছর অনায়াসে চলতে পারে। কয়লার খনি থেকে কয়লা তুলে নিলে খনি যেমন অকেজো হয়ে যায়, এই উদ্যানে কিন্তু তা হবে না। গাছ বার বার লাগান যেতে পারবে।

সামুদ্রিক জৈব পদার্থ থেকে ব্যাকটিরিয়া যেভাবে পেট্রোলিয়াম তৈরী করেছিল—জীবজগতের আবর্জনা থেকে আমরা সেই পদ্ধতিতে শক্তি পেতে পারি। অক্সিজেন ছাড়াই এইসব ব্যাক্টিরিয়া নীচু তাপমাত্রায় জৈব আবর্জনার অণু ভেঙে মিথেনে রূপান্তরিত করে। বিজ্ঞানী উল্‌ফ্ বলেন, কোন্ ব্যাকটিরিয়া এই রূপান্তর আনে তা জানা নেই। তবে দু' রকমের ব্যাক্টিরিয়া এই কাজে অংশ নেয়। প্রথম ব্যাক্টিরিয়া জৈব পদার্থ ভেঙে জৈব এ্যাসিড, হাইড্রোজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড তৈরী করে আর দ্বিতীয়টি প্রথমটির অবশেষের উপর বেঁচে থাকে ও মিথেন তৈরী করে। এই পদ্ধতির সব তথ্য এখনও জানা নেই —তবু তার প্রয়োগ সম্ভব হয়েছে। ভারতে গোবর-গ্যাস উৎপাদন এই পদ্ধতিতেই সফল হয়েছে।

এই সব চেষ্টার সঙ্গে নিউক্লিয়াস থেকে শক্তি উৎপাদনের ব্যয়বহুল গবেষণাও চলেছে। বিকল্প শক্তি কোথায় পাওয়া যাবে—তা আজও অজানা।

বোস ইনসটিটিউট, ৯২ এ. পি, সি, রোড, কলি-৯

অজানা মহাকাশে
আমার সঙ্গে চালাকি করে খুব বোকামি করেছ। এর জন্য পস্তাতে হবে।
আপনি কি ভেবেছিলেন পৃথিবী জয় করতে আমি আপনাকে সাহায্য করবো?
মহামান্য জান এর মস্তিষ্ক-পরীক্ষা করতে বলেছেন।
তোমরা কোন খবরই পাবে না, শয়তান।
বরং উল্টো – সব খবরই তোমার মুখ দিয়ে বেরোবে
হঠাৎই দুজন মানুষ ঢুকে পড়লো ঘরে, ঝাঁপিয়ে পড়লো প্রহরীদের ওপর।
ওকে ছেড়ে দাও!
ও অজ্ঞান হয়ে গেছে। ধরে নিয়ে যেতে হবে।
জলদি! প্রহরীরা এখুনি এসে পড়বে।

অজানা মহাকাশে

৩৫
এবারে আমরা মহাকাশ-বন্দরে যাবো
৩৬
মহাকাশ বন্দরে এসে
ও, আপনারা আমার যানটাকে সারিয়ে ফেলেছেন দেখছি।
এখন তুমি আমাদের ভিতরে নিয়ে যাবে
এই যানের সমস্ত বিবরণ আমার চাই।
দুরন্ত-পরিবেশের খবরটা ওকে জানিয়ো না। তাহলে যানের পরিবেশ অন্তত সেকেণ্ডে হাজার মাইল করে কমানো যাবে।
এটাই পৃথিবীকে বাঁচানোর একমাত্র পথ
৩৭
৩৮
ব্যস্, হয়ে গেছে! দুরন্ত-পরিবেশের চাবিটা বন্ধ করা গেছে।
৩৯

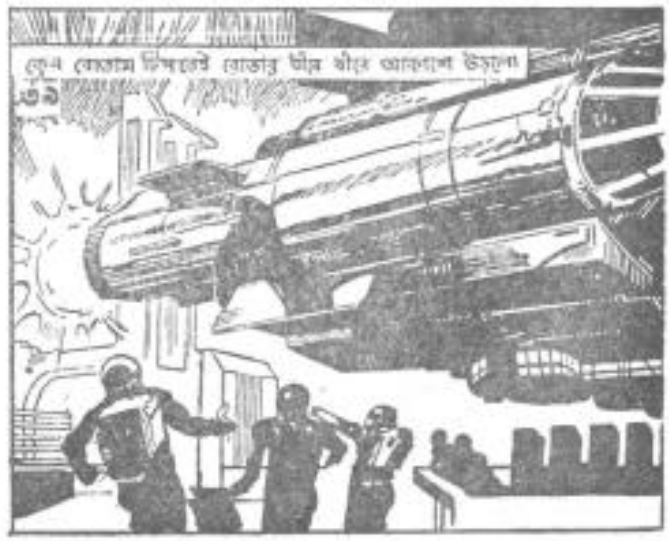

মাটি থেকে আকাশে ঃ মজার এক্সপেরিমেণ্ট

পার্থসারথি চক্রবর্তী

পাখিকে উড়তে দেখেই মানুষের আকাশে ওড়ার সাধ জাগে। অনেক অনেক কাল আগে যখন উড়োজাহাজ আবিষ্কার হয় নি তখন মানুষ কল্পনা করতো পাখির পিঠে চড়ে সে কেমন চাঁদের দেশে উড়ে চলেছে। গুসমাও-এর ১৭০৯ সালে আঁকা বিখ্যাত প্যাসা রোলা ছবিটা দেখলেই তোমরা তা বুঝতে পারবে।

বিভিন্ন পাখির ডানার গঠনে পার্থক্য আছে। চড়ুই, বাজ, শকুন, ঈগল প্রভৃতি পাখির ডানার ছবি এঁকে তা দেখতে পারো। পাখির ডানার গঠনের দিকে লক্ষ্য রেখেই পরবর্তী কালে উড়োজাহাজের বিভিন্ন মডেল তৈরী হয়েছে। পাখি শুধু তার ডানা ঝাপটায় বলেই উড়তে পারে না—একথা তোমরা জান। কিভাবে উপরে উঠে ভেসে থাকা যায় তা আবিষ্কার করেন অষ্টাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত সুইস বিজ্ঞানী ডানিয়েল বারনৌলি। যখন কোনও বাতাস অথবা কোনও গ্যাস বা কোনও তরল পদার্থ দ্রুত প্রবাহিত হয় তখন তার চাপ কমে যায়। প্রবাহের গতিবেগ যত বেশি হবে—তার চাপও তত কমবে। উড়োজাহাজ সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় তার ডানার নীচের তলের চাইতে উপরের তল দিয়ে বাতাস খুব জোরে বেরিয়ে যায়। এর ফলে ডানার উপরের দ্রুত প্রবাহিত বাতাসের চাপ ডানার নীচের তলের বাতাসের চাপের চাইতে অনেক কমে যায়।

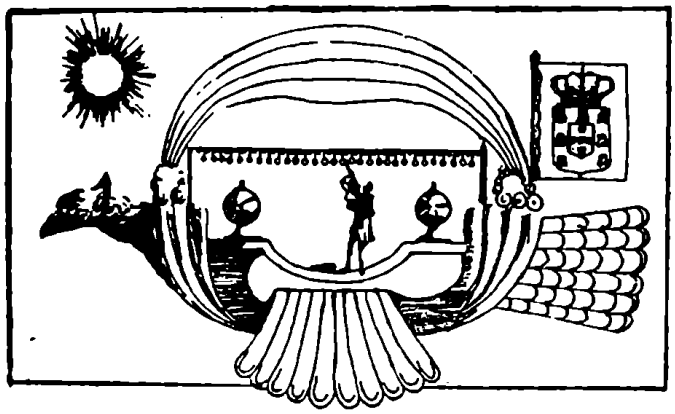

১৭০৯ সালে আঁকা প্যাসা রোলা। ছবি—১

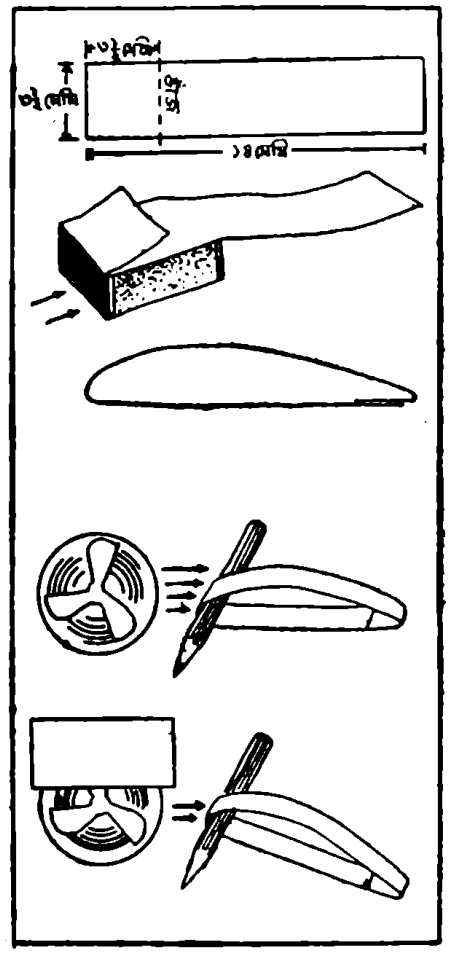

ছবি—২

তখন ডানার নীচের বাতাসের চাপ বেশী থাকায় ঐ ভারী প্লেনটা খুব সহজেই ভেসে থাকতে পারে। উড়োজাহাজই হোক অথবা পাখিই হোক, আকাশে ওড়ার এটাই হচ্ছে সব চাইতে বড় কথা। এস, আমরা একটা মজার এক্সপেরিমেণ্ট করে বারনৌলির এই আবিষ্কারকে বুঝতে চেষ্টা করি। এতে যন্ত্রপাতিও বিশেষ লাগবে না। আমাদের দরকার হবে ১৪ সেণ্টিমিটার লম্বা ও ৩½ সে. মি. চওড়া এক ফালি কাগজ, একটা দেশলাইয়ের বাক্স আর কিছু আঠা।

কাগজের ফালিটা নিয়ে ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে সেইরকম ওটার পিছন দিকে ৩½ সে. মি. অংশ ভাঁজ করে নাও। এইবার ভাঁজ করা অংশটা যেখানে শেষ হচ্ছে সেখান থেকে বাকী অংশটা আঠা দিয়ে একটা

দেশলাইয়ের বাক্সের উপরে জুড়ে দাও। এইবার কাগজের ফালির ভাঁজ করা জায়গার দিক থেকে জোরে ফুঁ দাও। দেখবে, সামনের বেরিয়ে থাকা কাগজের ফালিটা ওপরের দিকে ঠেলা দিচ্ছে। কাগজের ফালির ওপরে বাতাসের চাপ কম। তাই নীচের বাতাসের চাপে ওটাকে ওপরের দিকে ঠেলা দিচ্ছে। ওটা এইজন্যে ভেসেও থাকতে পারবে—পড়ে যাবে না।

বারনৌলির আবিষ্কারকে আরও একটা সহজ এক্স-পেরিমেণ্ট করে বুঝা যায়। একটা মোটা কাগজ (ত্রিশ সে. মি. লম্বা ও ৫ সে. মি. চওড়া) কাঁচি দিয়ে কেটে

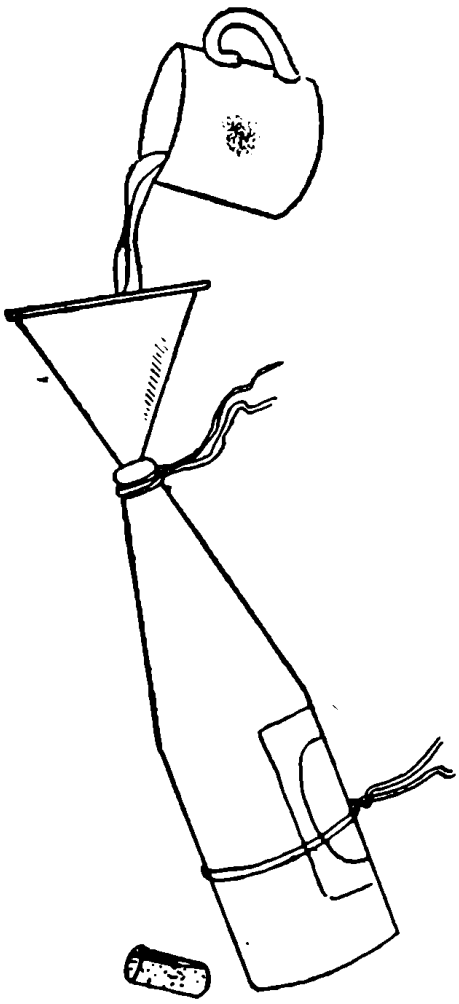

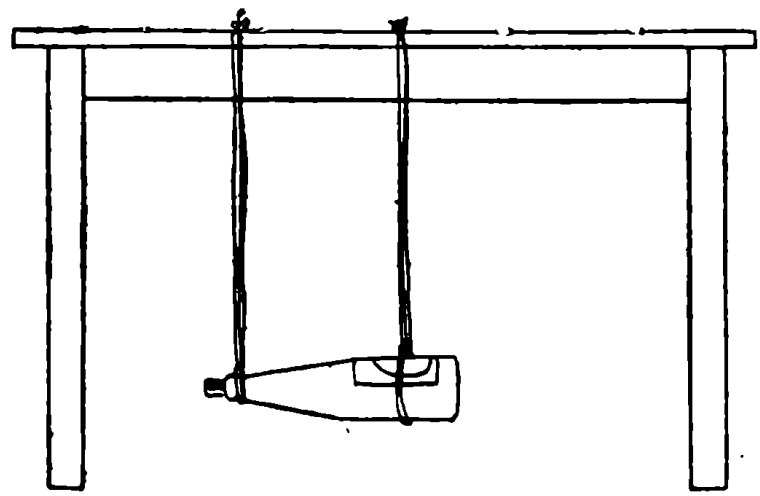

ছবি—৩

সেটার মুখ দুটোকে ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে সেইভাবে আঠা দিয়ে জোড়। দেখবে কেমন সুন্দর অনেকটা এরোপ্লেনের ডানার মত দেখতে একটা অংশ (লুপ) তৈরী হয়ে গেল। এবার একটা পেন্সিল ওই লুপের মধ্যে ঢুকিয়ে ওটাকে একটা টেবিল পাখার সামনে ধর। সাথে সাথে দেখতে পাবে কেমন সুন্দরভাবে তোমার তৈরী উড়োজাহাজের ডানার মতো অংশটা উপরের দিকে উঠছে!

এবার একটা পিচবোর্ড ওই টেবিল পাখার সামনে এমন ভাবে ধর যেন বাতাস লুপের উপরের অংশ দিয়ে ভালভাবে বইতে না পারে। এবার দেখবে, বাতাস বইতে পারছে না বলে লুপটা নীচের দিকে ঝুঁকে পড়েছে—উপরে ওঠে নি মোটেই।

এরোপ্লেন কিভাবে এগিয়ে যায় তা বারনৌলির সূত্র থেকে মোটামুটি আমরা বুঝতে পারলাম। আচ্ছা, রকেট এবং জেট-প্লেন কিভাবে এগিয়ে যায় তা জানো? নিউটনের ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়ার সূত্র তোমরা এতদিনে নিশ্চয়ই জেনেছ। যখনই কোনও ক্রিয়া ঘটবে সাথে সাথে উল্টোদিকে সমপরিমাণ প্রতিক্রিয়াও হবে। বন্দুক থেকে গুলি ছোঁড়ার সময় বন্দুকটা পিছনের দিকে ঠেলা মারে। বন্দুক থেকে গুলি বেরিয়ে যাওয়াটা হচ্ছে ক্রিয়া আর পিছনদিকে সমপরিমাণ যে ঠেলা মারে সেটা প্রতিক্রিয়া। জেট ও রকেট এই একই নিয়মে এগিয়ে যায়। এই এগিয়ে যাবার জন্য এদের চারপাশের বাতাসকে কাজে লাগানোর দরকার হয় না মোটেই। রকেটের পেছন থেকে গরম বাতাস বেরিয়ে গিয়ে রকেটকে সামনের দিকে ঠেলে দেয়। এই মজার এক্সপেরিমেণ্টটা দেখাতে হলে আমাদের চাই—একটা বোতল, ঐ বোতলে লাগাবার কর্কের ছিপি, দু'মিটার লম্বা কিছু সুতো, দুটো

ড্রইং পিন, দু'চামচে বেকিং সোডা, একটা কাপের সিকিভাগ ভিনেগার, একটা ফানেল।

প্রথমে বোতলটাকে শক্ত সুতো দিয়ে টেবিলের সাথে ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে সেইভাবে ঝুলিয়ে দাও। লক্ষ্য রাখবে বোতলটা যেন মেঝের থেকে কয়েক ইঞ্চি উপরে থাকে। এইবার বোতলের ভিতর কয়েক চামচ বেকিং সোডা ঢালো। তারপর ফানেলের সাহায্যে বোতলের মধ্যে কাপের সিকিভাগ ভিনেগার ঢেলে দাও। খুব তাড়াতাড়ি বোতলের মুখটা ছিপি দিয়ে বন্ধ করে (খুব শক্ত করে আটকাবে না কিন্তু) ওটাকে নিজের

এবার যে ছোট্ট অথচ মজার এক্সপেরিমেন্টটা আমরা করব তার সাহায্যে জানতে পারা যাবে উড়োজাহাজকে কেমন করে কন্ট্রোল করা যায়। এরোপ্লেনের বডির মোটামুটি তিনটে অংশের সাহায্যে ওটাকে কন্ট্রোল করা যায়। এগুলো হচ্ছে—এইলেরনস, (দু'পাশের দুটো ডানায় থাকে) রাডার আর এলিভেটর।

একটা পোস্টকার্ড নিয়ে সেটাকে ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে সেইভাবে ভাঁজ কর। পোস্টকার্ডের একদিকে ২৫ সে. মি. লম্বা একটা শোলা আটকে দাও। মডেলটার ব্যালান্সপয়েন্ট বার করে তার মধ্যে একটা পিন ঢুকাতে

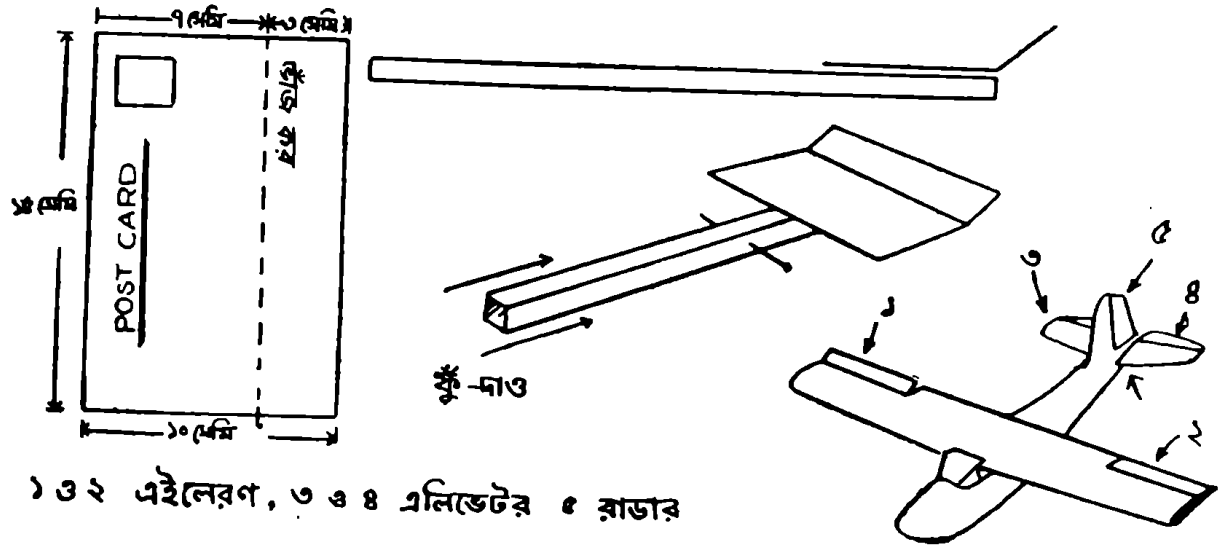

ছবি—৪

জায়গায় ঝুলতে দাও। ভিনেগার আর বেকিং সোডার বিক্রিয়ায় কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস তৈরী হয়ে বোতলের ভিতর চাপ দেবে। এর ফলে ওর মুখের ছিপি সশব্দে বাইরে বেরিয়ে আসবে। এটাই হ'ল ক্রিয়া। ছিপিটা যে দিকে ছুটে যাচ্ছে, বোতলটা সরে আসবে ঠিক তার উল্টো দিকে। এটাই হ'ল প্রতিক্রিয়া।

একটা বেলুন ফুলিয়ে যদি তার বাতাসকে ছেড়ে দাও তাহলেও দেখবে বাতাসটা যেদিকে বেরিয়ে যাবে—বেলুনটা ছুটবে ঠিক তার বিপরীত দিকে। রকেট ও জেটপ্লেন এই একই নিয়মে এগিয়ে যায়।

হবে। এবার এলিভেটরটাকে ৪৫° কোণ করে বসাও। এখন এই লেজওয়ালা এরোপ্লেনের মডেলে ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে সেইভাবে ফুঁ দাও। দেখতে পাবে, শোলার সামনের দিকের অংশটা উপরে উঠছে, ঠিক যেমন উড়োজাহাজ উপরে উঠবার সময় তার নাকটা উপরের দিকে ওঠে। ছোট্ট একটা এরোপ্লেনের মডেল তৈরী করে দেখতে পারো রাডার কিভাবে এরোপ্লেনকে ঘুরাতে পারে আর এইলেরন এরোপ্লেনের ডানাকে ঝুঁকতে সাহায্য করে।

আর, এইচ, এস, নিউ আলিপুর (সাহাপুর)
ব্লক-এন, ফ্ল্যাট-৭, কলিকাতা-৭০০০৩৮

বাঁদর

আমেরিকার বাঁদর, মারমোসেট্, লিমারাদি, ল্যাজুক বাঁদর

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

আমেরিকার বাঁদর

আমেরিকার সব বাঁদরই ছোট্টখাট্ট। গরিলা, শিম্পাঞ্জী তো দূরের কথা, আমাদের হনুমানের মতো বড় বাঁদরও সেখানে নেই।

আমেরিকার বাঁদরদের মুখ খুব চওড়া। তার ফলে নাকের ফুটো দুটোও বেশ দূরে দূরে। এদের গালে থলি নেই। পাছাতে কড়াও না। এশিয়া ও আফ্রিকার বাঁদরদের বত্রিশটি করে দাঁত হয়। আমেরিকার "মারমোসেট্" (Marmoset) ছাড়া সব বাঁদরেরই ছত্রিশটা করে দাঁত থাকে।

মারমোসেট

বাঁদররা পা দিয়ে হাতের মতো কাজ করতে পারে। তাই এদের বলা হয় চতুর্হস্ত (চারহাতওলা) জন্তু। আমেরিকার বেশির ভাগ বাঁদরই ল্যাজকে হাতের মতো কাজে লাগায়। ল্যাজ দিয়ে জিনিসপত্র ধরে। খাবার জিনিস মুখে পোরে। ল্যাজ দিয়ে গাছের ডাল আঁকড়ে হাত-পা ঝুলিয়ে দিব্যি দোল খায়। এশিয়া আফ্রিকার কোন জাতের বাঁদরই এরকমটা পারে না।

আমেরিকার বাঁদরদের মধ্যে সাপাজু ও মাকড়সা বাঁদর (Ateles) প্রধান। সাপাজু খুব ছোট আর দারুণ ভীতু। চট করে নীচে নামতে চায় না। গাছের ডালে বাসা তৈরী করে থাকে। মাকড়সা বাঁদর দেখতে একটু বড়। ডালে ল্যাজ পাকিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে এরা দোলে। তখন মনে হয় একদল বড় মাকড়সা দুলছে। এ জন্যেই এদের নাম মাকড়সা বাঁদর।

মারমোসেট্

দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিলে মারমোসেট পাওয়া যায়। দেখতে বড় কাঠবেড়ালীর মতো। এমন শান্ত-শিষ্ট বাঁদর দেখা যায় না।

মারমোসেটের সারা গা নরম লোমে ঢাকা। এদের কানের দু' পাশেও গোছা গোছা লোম বেরোয়। সেই লোম চামরের মতো গলার চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এদের কারোর গায়ের রঙ সাদা, কারোর কালো। কারোর বা হলদে। সাদা-কালোয় ডোরা ডোরা মারমোসেটও দেখা যায়। শরীরের থেকে এদের ল্যাজ লম্বা। ল্যাজে ঝাঁকড়া লোম বোঝাই। আমেরিকার আর সব বাঁদরের বত্রিশটি দাঁত থাকলেও এদের আছে ছত্রিশটি। মারমোসেট খুব পোষ মানে। যিনি পোষেণ, অনেক সময় তাঁর হাতের ওপরও বসে থাকে চুপচাপ। এরা ফল, পোকা-মাকড় খায়।

লিমারাদি

লিমারদের প্রায় পঞ্চাশটা জাত আছে। এরা খুব পুরনো জাতের বাঁদর। এরা বেশির ভাগই মাদাগাস্কার দ্বীপে থাকে। আফ্রিকা আর পূর্বভারত দ্বীপপুঞ্জেও এদের দেখতে পাওয়া যায়। জাতি অনুযায়ী এদের চেহারা আর গায়ের রঙ আলাদা আলাদা। এরা দল বেঁধে থাকে। ছটফটে হলেও বেশ পোষ মানে। ফলমূল, পোকা-মাকড়, ইঁদুর ব্যাং খায়। এরা সাধারণতঃ রাতে বেরিয়ে আসে।

ওই সময় নানারকম আওয়াজ করে। এজন্য ঐসব দেশে এদের রাতের ভূত বলা হয়।

লাজুক বাঁদর

আসাম, ত্রিপুরা, পূর্ববাংলা, চট্টগ্রাম ও দাক্ষিণাত্যে (Loris Gracilis) লিমারের এক বংশ আছে। এদের বাংলায় বলে লাজুক বাঁদর। সারাদিন মুখে টুঁ শব্দটি নেই। একপাশে ঘাড় গুঁজে বসে থাকে। জ্বালাতন করলে বা খোঁচাখুঁচি দিলে মাথা তোলে। তারপরই আবার মাথা নিচু করে। এরা সব কিছু খায়। লম্বায় হয় আট থেকে পনের ইঞ্চি। মালয় উপদ্বীপে এক রকম উড়ো লিমার দেখা যায়। এরা পুরোপুরি নিরামিষাশী।

গ্রন্থকারের 'পশুপক্ষী' হইতে পুনর্লিখিত

মাকড়সা বাঁদর ও লাজুক বাঁদর

ভেবে চিন্তে উত্তর দাও শুভব্রত রায়চৌধুরী

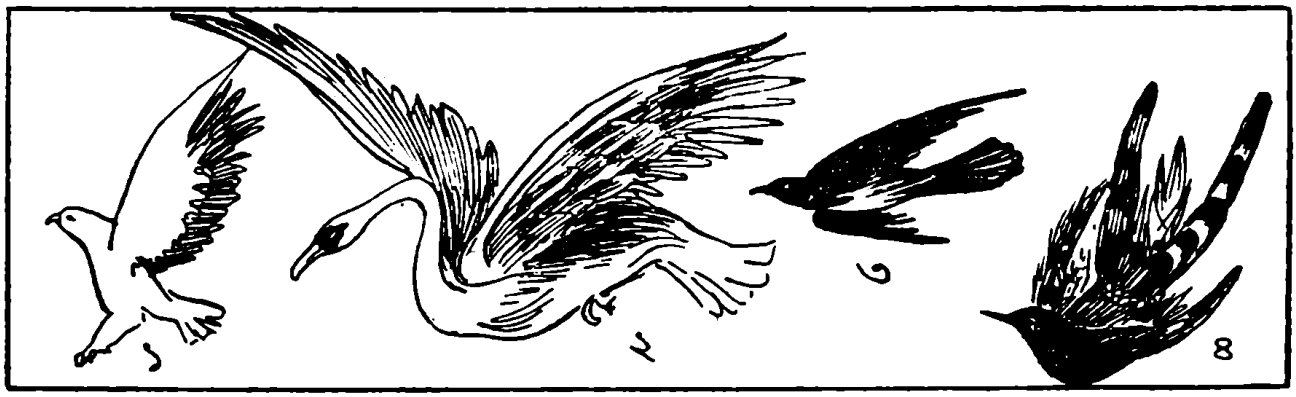

উপরের ছবিতে (১--৪) চারটে পাখিকে উড়ন্ত অবস্থায় দেখা যাচ্ছে।

(১) নং পাখিটি ঘণ্টায় ৬৫—৭৫ মাইল বেগে উড়তে পারে (২) নং পাখিটি ৬৫-৭০ মাইল বেগে উড়তে পারে (৩) নং পাখিটি ৬০-৬৫ মাইল বেগে উড়তে পারে এবং (৪) নং পাখিটি ৫৫—৬০ মাইল বেগে উড়তে পারে। পাখিগুলোর নাম বলো।

(২) এক্ (E K) কি ?

(৩) 'ক' লি কাদের বলে ?

(৪) এক প্রকার সামুদ্রিক জীব। এদের শোষক বা জল শোষক বলে। এদের 'ইংরাজী' নাম বলো।

(৫) ডুবো জাহাজ কে আবিষ্কার করেন ?

(৬) বরফের উপর দিয়ে কিভাবে হাঁটা সহজ ?

(৭) বিগত ১৪ই এপ্রিল, ১৯৮১ 'কলম্বিয়া' নামক উপগ্রহবাহী রকেটটি ৫৪ ঘণ্টা মহাকাশে অভিযান করে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে ক্যালিফোরনিয়ায় (আমেরিকা) ফিরে আসে। বলতে পারো এটি কে চালনা করেন ?

(৮) 'আলেয়া' কি ?

(উত্তর পরবর্তী সংখ্যায়)

সংখ্যাকূট : জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার সমাধান

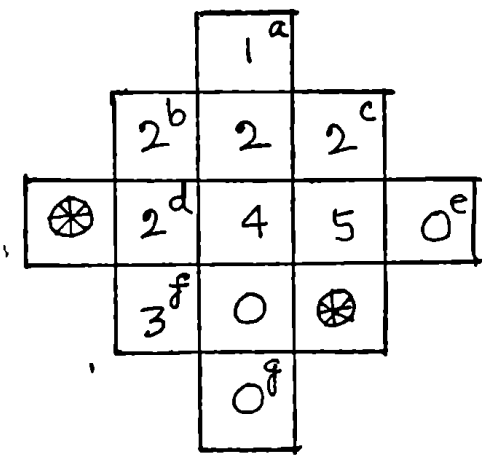

আবিষ্কারের গল্প

অনুপ্রভা পদার্থ

বিবেক রায়

তোমরা হয়তো জান যে, আলোক বিকিরণের একটি বিশেষ ধর্মের নাম 'ফসফোরেসেন্স'। বাংলায় একে আমরা 'অনুপ্রভা' বলে থাকি। এমন কতকগুলি পদার্থ আছে, যাদের ওপর আলো ফেললে সেই পদার্থগুলি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোক বিকিরণ করে। আলো ফেলা বন্ধ করার পরও কিছুক্ষণ ঐ সব পদার্থ থেকে আলোক বিকিরণ চলতে থাকে। এই ঘটনাকে অনুপ্রভা বলা হয় ও এই ধরনের পদার্থগুলিকে অনুপ্রভ পদার্থ বলা হয়। অনুপ্রভার স্থায়িত্ব কয়েক সেকেণ্ড থেকে শুরু করে কয়েক ঘণ্টাও হ'তে পারে। ক্যালসিয়াম সালফাইড, বেরিয়াম সালফাইড, স্ট্রনসিয়াম সালফাইড প্রভৃতি পদার্থগুলি অনুপ্রভ পদার্থ। ঘড়ির কাঁটা, বৈদ্যুতিক সুইচ, অনুপ্রভ পেইণ্ট প্রভৃতিতে অনুপ্রভ পদার্থ ব্যবহৃত হয়।

'হেনরী বেকারেল' নামে এক ফরাসী বিজ্ঞানী 1896 সালে ইউরেনিয়াম সালফেট লবন নিয়ে তার অণুপ্রভা আছে কিনা তা পরীক্ষা ক'রে দেখছিলেন। এই পরীক্ষার জন্যে তিনি ফটোগ্রাফিক প্লেট নিয়ে সেটিকে দু'খানি কালো কাগজ দিয়ে খুব ভাল ক'রে মুড়ে রেখেছিলেন। কিছুক্ষণ রাখার পর তিনি দেখেন যে, ফটোগ্রাফিক প্লেটটি আলো দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। ফলে তার ওপর আলোর দাগ পড়েছে। তাই দেখে বেকারেল বুঝতে পারলেন যে পরীক্ষাধীন ইউরেনিয়াম লবনটি নিশ্চয়ই এমন এক অদৃশ্য রশ্মি বিকিরণ করছে যা কালো কাগজের আবরণ ভেদ করে ফটোগ্রাফিক প্লেটে গিয়ে পড়েছে।

বেকারেল ঐ পরীক্ষাটি আবার করবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু ক'দিন আকাশ এমনি মেঘাচ্ছন্ন হয়ে রইলো যে সূর্যের মুখই দেখা গেল না। বেকারেল তখন হতাশ হ'য়ে তাঁর ঘরের একটি আলমারির ড্রয়ারে নতুন ফটোগ্রাফিক প্লেটগুলিকে একটির পর একটি স্তরে স্তরে সাজিয়ে রাখলেন। সবচেয়ে ওপরের প্লেটখানির ওপরে রাখলেন ইউরেনিয়াম সালফেটের লবন ভরা কৌটাটি। তারপর ড্রয়ার দিলেন বন্ধ করে।

ড্রয়ারের মধ্যে জিনিসগুলি ক'দিন অমনিভাবেই পড়ে রইলো। তারপর একদিন বেকারেলের কি খেয়াল হলো কে জানে! ফটোগ্রাফিক প্লেটগুলি কেমন অবস্থায় আছে তা পরীক্ষা ক'রে দেখার জন্যে তিনি ড্রয়ার খুললেন। সবচেয়ে ওপরে রাখা প্লেটখানিকে বের করে ডেভেলপ করার পর যা দেখলেন তাতে তাঁর বিস্ময়ের সীমা রইলো না। ইউরেনিয়াম লবন যে কৌটায় ছিল, সেই কৌটারই সুন্দর ও স্পষ্ট ছায়া ফুটে উঠেছে ডেভেলপ করা প্লেটখানিতে।

—কি ক'রে এটা সম্ভব হলো তা ভাবতে ভাবতে বেকারেল বুঝতে পারলেন যে, সূর্যরশ্মির দ্বারা ফটোগ্রাফিক প্লেট আক্রান্ত হয় নি; আক্রান্ত হয়েছে ইউরেনিয়াম লবন থেকে নির্গত কোনও অদৃশ্য রশ্মি দ্বারা।

সত্যিই তাই। ইউরেনিয়াম-ঘটিত লবন থেকে সর্ব অবস্থায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে কয়েক রকম অদৃশ্য রশ্মি নির্গত হয়। অদৃশ্য রশ্মি নির্গমনের এই ধর্মকে বলা হয় 'তিজস্ক্রিয়তা', ইংরেজীতে 'রেডিও অ্যাকটিভিটি'। আর যে সব পদার্থ থেকে ঐ রকম অদৃশ্য রশ্মি নির্গত হয়, সেইসব পদার্থকে বলা হয় তেজস্ক্রিয় পদার্থ।

হেনরী বেকারেল আকস্মিকভাবেই তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার করেছিলেন। আর বিজ্ঞানের অগ্রগতির ক্ষেত্রে সেই আবিষ্কারের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।

বেকারেল এ বিষয়ে আরও পরীক্ষা চালিয়ে প্রমাণ করেন যে, কেবল ইউরেনিয়াম সালফেটই নয়, ইউরেনিয়ামের যে কোন যৌগেরই এই রকম অদৃশ্য রশ্মি বিকিরণের ক্ষমতা আছে। তিনি আরও প্রমাণ করেন যে, এই রশ্মি এক্স রশ্মির মতো বিবিধ বাধা অতিক্রম করতে পারে। এক্স রশ্মির সঙ্গে এই রশ্মির প্রধান পার্থক্য এই যে, এক্স রশ্মি নিস্তড়িৎ কিন্তু তেজস্ক্রিয় রশ্মি তড়িৎ আধানযুক্ত।

হেনরী বেকারেলের এই আবিষ্কার বিজ্ঞানী মহলে প্রচণ্ড কৌতূহল সৃষ্টি করে। মাদাম কুরী ও তাঁর স্বামী পীয়ের কুরী প্রমাণ করেন যে, কেবল ইউরেনিয়ামই নয়, থোরিয়ামও অনুরূপ রশ্মি বিকিরণে সক্ষম। তাছাড়া বিশুদ্ধ ইউরেনিয়াম অপেক্ষা ইউরেনিয়ামের আকরিক 'পিচ ব্লেণ্ডের' এই রকম রশ্মি বিকিরণের ক্ষমতা অনেক বেশী। কুরী দম্পতি পিচব্লেণ্ড থেকে দু'টি মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার করেন—পোলোনিয়াম ও রেডিয়াম। এই দু'টি মৌলও তেজস্ক্রিয় রশ্মি বিকিরণে সক্ষম। তাঁরা পরীক্ষা ক'রে দেখান যে, রেডিয়ামের পরমাণুগুলি আপনা থেকেই ভেঙ্গে যায়। আর সেই সময় পরমাণুর কেন্দ্র থেকে শক্তি ও কণা বেরিয়ে আসে।—এর থেকেই প্রমাণিত হয় যে

ডিমোক্রিটাস ও ডালটনের থিওরি ভুল। পরমাণু আর অবিভাজ্য নয়।

পরে গবেষণার ফলে জানা যায় যে, ইউরেনিয়াম, রেডিয়াম, থোরিয়াম ইত্যাদি তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে সর্বদা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তিন রকমের তেজস্ক্রিয় রশ্মি বেরোয়। এদের একটির নাম আলফা রশ্মি, যা ধনাত্মক তড়িৎ আধানযুক্ত কণার সমষ্টি। দ্বিতীয়টি বিটা রশ্মি, ঋণাত্মক তড়িৎ আধানযুক্ত কণার সমষ্টি। আর তৃতীয়টির নাম গামা রশ্মি। এটি এক্স রশ্মির চেয়েও ক্ষুদ্রতর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের তড়িৎ চুম্বকীয় রশ্মি। তেজস্ক্রিয় মৌল এমনিভাবে নিজেদের দেহ থেকে তেজ-কণা বের ক'রে দিয়ে এক সময় সম্পূর্ণ নতুন মৌলে পরিণত হয়।

সবচেয়ে ভারী তেজস্ক্রিয় মৌল ইউরেনিয়াম। একটি ইউরেনিয়াম পরমাণু থেকে ক্রমাগত আলফা, বিটা ও গামা রশ্মি নির্গমনের ফলে ইউরেনিয়াম পরমাণুটি অবশেষে সীসার পরমাণুতে পরিণত হয়। অনুরূপভাবে একটি থোরিয়াম পরমাণু রূপান্তরিত হয় ক্যালসিয়াম পরমাণুতে। তেজস্ক্রিয়তার দরুন পরমাণুর এই রূপান্তর ঘটে সম্পূর্ণরূপে নিউক্লিয়াসের ভেতর থেকে। নিউক্লিয়াস হলো পরমাণুর কেন্দ্রস্থল। বাইরের আবহাওয়ার তারতম্য মৌলের এই রকম রূপান্তর প্রক্রিয়াকে বিন্দুমাত্র প্রভাবিত করতে পারে না।

পোঃ খড়গপুর, মেদিনীপুর

'চিকিৎসা বিজ্ঞানে স্মরণীয় যাঁরা'

চিকিৎসাবিজ্ঞানে উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার এবং উদ্ভাবনার জন্যে যাঁরা বিখ্যাত হয়েছেন তাঁদের জেনে রাখো ঃ

রিচার্ড ব্রাইট। জন্ম ১৭৮৯, ব্রিটেনে ; মৃত্যু ১৮৮৫। চিকিৎসক। তিনিই প্রথম 'নেফ্রাইটিস' রোগটি ব্যাখ্যা করেন। তাঁর নামে এই রোগটিকে ব্রাইট-এর রোগও বলা হয়।

রবার্ট ব্রাউন। জন্ম ১৭৭৩, ব্রিটেনে ; মৃত্যু ১৮৫৮। চিকিৎসক। ১৮৩১ সালে তিনিই প্রথম জীবিত কোষে নিউক্লিয়াস আবিষ্কার করেন।

স্যার ডেভিড ব্রুস। জন্ম ১৮৫৫, ব্রিটেনে ; মৃত্যু ১৯৩১। 'মাল্টা জ্বর' এবং ঘুম রোগের জীবাণুর আবিষ্কারক।

অ্যালবার্ট লিয়ঁ কামে। জন্ম ১৮৬৩, ফ্রান্সে ; মৃত্যু ১৯৩৩। জীবাণু বিজ্ঞানী 'বি সি জি' ভ্যাকসিনের অন্যতম আবিষ্কারক। এই ভ্যাকসিন টিবি রোগ নিরোধক।

ফ্রান্সিস এইচ, সি, ক্রিক (১৯১৬--)। ব্রিটিশ পদার্থবিজ্ঞানী এবং জীববিজ্ঞানী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রেডার উদ্ভাবনায় সাহায্য করেন। বংশগতির ধারক 'জিন' এর মৌলিক উপাদান 'ডি এন এ' র গঠন আবিষ্কার করে ১৯৫৩ সালে নোবেল পুরস্কার পান। পদার্থ বিজ্ঞানী হয়েও যে জীববিজ্ঞানে গবেষণা করা যায়, ক্রিক তাঁর বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত।

আলেকসিস কারেল (১৮৭৩-১৯৪৪) ফরাসী শল্যচিকিৎসক। প্রানীদেহ থেকে কোষকলা বিচ্ছিন্ন করে দেহের বাইরে গবেষনাগারে কৃত্রিম উপায়ে সেই কোষকলা জীবন্ত অবস্থায় রাখার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এই কৃতিত্বের দরুন তাঁকে নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

ফার্দিনন্দ জে. কহন (১৮২৮-৯৮) জার্মান জীববিজ্ঞানী তিনিই প্রথম প্রমান করেন ব্যাকটেরিয়াও উদ্ভিদের সমগোত্রীয়।

কার্লফার্দিনান্দ কোরি (১৮৯৬-) এবং তাঁর স্ত্রী **গের্টি থেরেসা রাদনিট্জ কোরি** (১৮৯৬-১৯৫৭)। চেকোশ্লোভাকিয়ায় জন্ম। পরে মার্কিন নাগরিক। এনজাইম কী ভাবে স্টার্চকে চিনিতে রূপান্তরিত করে এই ঘটনাটি তাঁরা আবিষ্কার করে নোবেল পুরস্কার পান।

হার্ভে কুশিং (১৮৬৪-১৯৪৩)। মার্কিন শল্যচিকিৎসক। মস্তিষ্কের অস্ত্রোপচারের কৌশল আবিষ্কার করে তিনি বিখ্যাত হন।

জর্জ ওয়াশিংটন ক্রিল (১৮৬৪—১৯৪৩)। মার্কিন শল্যচিকিৎসক। রক্তের উচ্চচাপ, শরীরে রক্ত-সঞ্চালন এবং স্নায়ুর ত্রুটির দরুন জ্ঞানরোধ প্রভৃতি চিকিৎসায় অস্ত্রোপচারের কৌশল আবিষ্কার করেন।

* নামের পাশে (১৭৮৯-১৮৫৮) এধরনের সাল থাকলে বুঝতে হবে প্রথম সালে জন্ম, পরের সালে মৃত্যু)। আর যদি (১৮৯৬—) এমন থাকে বুঝতে হবে ১৮৯৬ সালে জন্ম, এবং এখনও তিনি জীবিত রয়েছেন।

হারুলের বিজ্ঞান-ভাবনা

ধীরেন বল

বাস্তবের মুখোমুখি

সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রিয় চেতনার ক্ষেত্রে প্রাক স্বাধীনতা যুগে যে শহর কলকাতা সমগ্র ভারতবর্ষে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল, স্বাধীনতার তিরিশ বছরের মধ্যে জাতীয় নেতৃত্বের ঔদাসীন্য ও অবহেলায় চারদিক থেকে স্তূপীকৃত নৈরাশ্য তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে চাইছে।

এই শহরের সমস্যা চিত্র যেমন বিশাল তেমনি ভয়াবহ। আলোবাতাসহীন অন্ধকার নোংরা ঘিঞ্জি বস্তি, খোলা নর্দমা, খাটো পায়খানা, স্তূপীকৃত আবর্জনা, রাতে মশা দিনে মাছি, পথ কুকুর, ছাড়া গরু, পানীয় জলের অভাব, ফুটপাথের বাসিন্দা, ভাঙাচোরা রাস্তাঘাট, ট্রাফিক জ্যাম, হকারি, মস্তানি, ভণ্ডামি, ভেজাল ওষুধ, মদের চোরাকারবার, জুয়া, অপসংস্কৃতি সব মিলিয়ে আমাদের টানে এক অতলান্ত গহ্বরের দিকে।

কিন্তু তবু এই কলকাতায় নৈরাশ্যের অন্ধকারের মধ্যে থেকেই জীবনের শত সহস্র আলোর ধারা ছড়িয়ে পড়ে। খেলার মাঠে, ময়দানের সভায়, পথে পথে মিছিলে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

আশাবাদী মানুষ, সরকার যদি উদ্যোগী হয় তাহলে মানুষ ধৈর্য্য ধরতে এবং সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতেও প্রস্তুত। তাই আমাদের আবেদন:

(১) জলের অপচয় করবেন না। কলের মুখ খোলা দেখলে বন্ধ করে দেবেন।

(২) নির্দিষ্ট পাত্রে ছাড়া রাস্তায় কোথাও জঞ্জাল ফেলবেন না।

(৩) রাস্তার বাতিস্তম্ভ থেকে বিদ্যুৎ চুরি একটি ঘৃণ্য অপরাধ।

(৪) দেওয়ালে কুৎসিৎ কিছু লিখবেন না।

(৫) ফুটপাথ পথচারীদের, এখানে কায়েমী স্বত্ব গড়ে তুলবেন না।

(৬) রাজস্ব আদায় সমৃদ্ধির অন্যতম চাবিকাঠি: কর বাকী ফেলবেন না।

(৭) ভেজালকারীদের চিহ্নিত করে সংগঠিতভাবে তার শাস্তি দাবি করুন।

গঠনমূলক সমালোচনা এবং ঐকান্তিক সহযোগিতা আমাদের সমস্যা সমাধানের পথ সুগম করবে।

কলিকাতা পুরসভা কর্তৃক প্রচারিত।

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

নিয়মাবলী

গ্রাহকদের জন্য

- কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রতি ইংরাজী মাসের গোড়ায় প্রকাশিত হয়।
- প্রতি সংখ্যার মূল্য ২ টাকা। বারো মাসের বৈশাখ–চৈত্র গ্রাহক চাঁদা ২০ টাকা। শারদসংখ্যার মূল্য পৃথক।
- গ্রাহকদের ডাকমাশুল লাগবে না। **under certificate of posting**-এ গ্রাহকদের বই পাঠানো হবে। যারা রেজিস্ট্রী ডাকে নেবেন তাদের অতিরিক্ত ৩০ টাকা পাঠাতে হবে।
- **M. O.** বা **Bank Draft KISHOR JNAN-BIJNAN**-এর নামে পাঠাতে হবে।

এজেন্টদের জন্য

- ১০ কপির কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না। কমিশন শতকরা ২৫ টাকা।
- ভি. পি. বা ব্যাঙ্ক মারফৎ পত্রিকা পাঠানো হবে। ডাক-মাশুল লাগবে না।
- এজেন্টদের অর্ডার অনুযায়ী সংখ্যা পিছু ১ টাকা করে অগ্রিম জমা রাখতে হবে।
- এলাকা ভিত্তিক এজেন্সীর জন্য সাক্ষাতে অথবা চিঠিতে যোগাযোগ করুন।

লেখকের প্রতি

- বিদ্যালয় পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রী এবং সর্বসাধারণের উপযোগী জনপ্রিয় বিজ্ঞানের রচনা কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রকাশিত হবে। লেখার ভাষা ছোটদের উপযোগী এবং লেখার ভঙ্গি সহজবোধ্য হওয়া প্রয়োজন।
- ফুলস্ক্যাপ কাগজের একপিঠে বাঁদিকে মার্জিন রেখে স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লেখা পাঠাতে হবে।
- আনুমানিক শব্দসংখ্যা ২৫০০।
- লেখার সঙ্গে উপযুক্ত ছবি (লাইনড্রয়িং/হাফটোন)-যুক্ত থাকা প্রয়োজন।
- রচনার শেষে লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি যুক্ত থাকা প্রয়োজন।
- প্রকাশিত রচনার বিষয়ে সর্বপ্রকার দায়িত্ব লেখকের, কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান কর্তৃপক্ষের নয়।
- অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- যে কোন বিষয়ে আলোচনার জন্য সম্পাদকীয় দপ্তরে যোগাযোগ করতে হবে।

সম্পাদক: কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

শারদসঙ্কলন কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান
পুরস্কৃত

পঞ্চম নিখিলবঙ্গ শিল্প ও বিজ্ঞান শিবির - ৮১

পরিচালনায় : দি সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল

SAB

· প্রশংসা পত্র ·

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহযোগিতায় দি সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল আয়োজিত ও কলিকাতা তথ্যকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত পঞ্চম নিখিলবঙ্গ শিল্প ও বিজ্ঞান শিবির - ৮১ অনুষ্ঠানে ভারতবর্ষের জনসাধারণের মধ্যে বাংলা ভাষায় অতি সুন্দর ও সুপরিকল্পিত সহকারে বিজ্ঞান পত্রিকা "কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান" প্রকাশে সুষ্ঠু পদক্ষেপ ও বিজ্ঞান প্রসারে মানসিকতার উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টার ভিত্তিতে মাননীয় শ্রী রবীন বল মহাশয়কে এই সম্মানমূলক প্রশংসাপত্র অর্পিত হইল ॥

চিত্তব্রত মজুমদার
চেয়ারম্যান
পঞ্চম নিখিলবঙ্গ শিল্প ও বিজ্ঞান শিবির-৮১
ও
মন্ত্রী কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮১

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পক্ষে রবীন বল কর্তৃক ৮/১এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলকাতা ৭৩ হইতে প্রকাশিত এবং ৬ শিবু বিশ্বাস লেন, কলকাতা ৬, তাপসী প্রিন্টার্স হইতে মুদ্রিত। দাম দু' টাকা।